খেলা

নিখিলচন্দ্র সরকার

ত্রয়ী ॥ কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

'ত্রয়ী'র পক্ষ হইতে শ্রীমতী অণিমা দে কর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীদিলীপকুমার দে কর্তৃক দে প্রিন্টার্স ১৫৭ বি মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট কলকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই :

ধস

স্বপ্নের ধ্বনি

দুঃখে সুখে বাঁচা

সজনে নির্জনে

নদী যখন সাগরে

বিষয়সূচী:

খেলা ১ / সমুদ্রের কাছে ১৭ / ভাঁটার টানে ৩৭ / তাপ ৫৭ / সময় ৭৯ / অভিমন্যু ৯৯ / বাঁচার জন্যে ১১৬ / মায়ার হরিণ ১৩১ / কাঠের ঘোড়া ১৫৯ / করাত ১৬৬ /

জায়গাটা কনকের বেশ ভালই লেগেছে। আজ দশ-বার দিন হলো ওরা এসেছে। কিন্তু এরই মধ্যে ও খানিকটা পরিবর্তন বুঝতে পারছে। যেমন, খিদেটা ওর আগের চেয়ে বেড়েছে, আজকাল খেতে-টেতে ইচ্ছে করে। হজমের খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না। ভাজা-ভুজিও পেটে পড়ছে। আসলে, এখানকার পাতকুয়ার জলটা বেশ ভাল। তাছাড়া, সবচেয়ে সুখের কথা, এখানে এসে ওর ভাল ঘুম হচ্ছে।

বেশ শীত পড়েছে এখানে। বাড়িটাও মনের মতন। প্রচুর আলো-হাওয়া। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা বাড়িটায় রোদের ছড়াছড়ি। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। বাগানের ভেতর দিয়েই পথ। কাঁকর বিছানো। নানান জাতের ফুলগাছ। এ সময়টায় রঙ-বেরঙের গোলাপ ফুল ফুটে থাকে সবসময়। বড় বড় ডালিয়া, গাঁদা ফুল। মরসুমী ফুলের বাহারও কিছু কম নয়। গেটের কাছে দুটো ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। ফলের গাছ সব পেছনে। প্রচুর আতা গাছ। এসবের যত্নের জন্যে মালী আছে। দু'বেলা বাগানের তদারক করে। ডাল-পালা ছেঁটে দেয়। গাছে গাছে জল দেয়। কোথাও আগাছা জমতে দেয় না।

কনক তার অফিসের এক বন্ধুকে ধরে বাড়িটা পেয়েছে। আগে এসব বাড়ি কেউ ভাড়াটাড়া দিত না। আজকাল দেয়। অনেকের অবস্থাই পড়ে গেছে। বাড়ির মালিকও সবসময় এখানে থাকতে পারে না। প্রতি বছর এখন আসাও হয় না। এসব বাড়ি-ঘর-দোর দেখাশুনোর জন্যেও একটা মোটা টাকা খরচ হয়। এজন্যেই নাকি আজকাল ভাড়াটাড়া দেওয়া হয়। অনেক বাড়ি তো যত্নের অভাবেই পোড়ো, ভুতুড়ে বাড়ি হয়ে আছে। ওসব বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও গা ছমছম করে। এরকম কয়েকটা বাড়ি কনকদের চোখেও

পড়েছে। আগে আগে নাকি প্রচুর লোক আসত এখানে। মাস কয়েক খুব হই-হই হতো। জমজমাট করে দুর্গোপুজো, কালীপুজো হতো। বিজয়া সম্মেলন হতো বড় করে। গান-বাজনা যাত্রা-থিয়েটারও হতো। আজকাল আর হয় না। লোকের মনে আর সে সুখ নেই। তবু এসময়টায় এখানে ভিড় হয়। হাওয়া বদলের জন্যে লোকজন আসে। অনেকেই বাড়িটাড়ি বেচে দিয়েছে। যারা দেয়নি, তারাও কম আসে। ভাড়াটাড়া দিয়ে দেয়। ক'ঘর স্থায়ী প্রবাসী বাঙালীও আছে। তারা চাকরি-বাকরি করতে এসে এখানেই বাড়ি-ঘর করে থেকে গেছে। কনকের সঙ্গে এরই মধ্যে অনেকের আলাপ হয়েছে। ওদের কাছেই এ-সব খবরাখবর সে শুনেছে।

এখানে এসে ওদের বেশ ভালই লাগছে। কলকাতার কথা কনক যেন একেবারেই ভুলে গেছে। এখানে এসেও যদি ওখানকার সাত-ঝামেলার কথা ভাবতে হয়, তবে তো বেড়ানোটাই মাটি হয়ে যায়! তার চেয়ে এই ভাল, খাও দাও, বেড়াও, ঘুমোও। দিন তারিখও তার ভুল হয়ে যায়। হালকা মেজাজে শুধু ভেসে চলা।

আলো ফুটতে না ফুটতেই রোজ ঘুম থেকে সে উঠে পড়ে। বউ মেয়েকেও সে তুলে দেয়। হাতমুখ ধুয়ে স্টোভ ধরায়, চা করে। চা খেয়েই গায়ে গরম জামাকাপড় চাপিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে। মাফলার দিয়ে মাথা কান ভাল করে ঢেকে নেয় কনক। ওরা যখন বেরোয়, তখন ঘন কুয়াশা। ভাল করে কিছু দেখাও যায় না। পথঘাট ভেজা। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়েই কুয়াশা গায়ে মাখতে মাখতে ওরা অনেক দূর চলে যায়। যখন ফিরে আসে, তখন আর কুয়াশা নেই, আলোর জোয়ার বইছে। ওদের মতন অন্যেরাও বেরিয়ে পড়ে। ঘুরে বেড়ায়। এই রোদ্দুরটাও যে কত আরামের, এটা যেন এখানে এসেই ওরা প্রথম বুঝতে পারল। অনেকদিন ওরা বাজারটাও ঘুরে আসে। দশটার আগে এখানে বাজার বসে না। তেওয়ারীর মিষ্টির দোকানে গরম গরম জিলিপি, সেঁউ ভাজা, ল্যাংচা খেয়েটেয়ে ফিরে আসে।

জায়গাটা ঝুনুরও খুব পছন্দ হয়েছে। ওর চোখেমুখেও খুশির

একটা আমেজ। মনমরা ফ্যাকাসে ভাবটা ওর মুখের ওপর থেকে এখন অনেকটা সরে গেছে। বেশী হাঁটাহাঁটি করলেও এখন আর কষ্ট হয় না।

কনক একদিন হাসতে হাসতে বউকে জিজ্ঞেস করল, 'কিরকম বুঝছ ?'

'দুদিনেই কি সব বোঝা যায় ?' ঝুনু হাসি হাসি চোখে চেয়ে থাকে।

'আমার তো মনে হচ্ছে ভালই হবে।'

'ভাল হলেই তো ভাল।' ঝুনু চোখ টান টান করে হাসে। গলায় কৌতুক।

'তা কেন, শরীরে এখন একটু জোরটোর পাচ্ছ তো ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে জায়গাটা ভালই।' ওকে বেশ সপ্রতিভ দেখায়।

'ঠাকুর ঠাকুর করে শরীরটা এবার সারিয়ে তোল তো !' গলাটা কনকের আবেগে ও মমতায় ভরা।

ঝুনু কনকের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল অল্পক্ষণ। পরে চোখ ছোট ছোট করে সকৌতুকে শুধোয়, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ আমার শরীরের জন্যে এত ভাবনা ?'

কনক হেসে ফেলে। সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'কি আবার ব্যাপার, এমনি !'

'উঁহু, এত আবেগ তো আগে টের পাইনি।'

কনক ওর চোখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'আরে, বউয়েব শরীর -টরীর খারাপ থাকলে কি আর মনে সুখ থাকে। সব সুখ তো তোমাদের কাছেই।'

'বুঝেছি।' ঝুনুর চোখে রহস্য ফুটে ওঠে। মুচকি হেসে ও চলে যায়। কেন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ওর।

কনক বিয়ে করেছে আজ ন' বছর। বিয়ের পর পরই একবার বউকে নিয়ে পুরী গিয়েছিল। তারপর কোথাও আর যায়নি। বিয়ের বছর পুরোতে না পুরোতেই রিঙ্কি এল। ওর বয়েস এখন আট।

এরমধ্যে ওদের সাংসারিক ঝামেলা আরো বেড়েছে। ওরা

আলাদা সংসার করেছে। কনকের বাবা মারা গেছে। মা বড়দার ওখানে আছে। রিঙ্কির বছর আড়াই পরে আর একটা বাচ্চা হয়েছিল ওদের, বাঁচেনি। কিন্তু ঝুনুর শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। অনেকদিন ভুগেছে। ওই যে ঝুনুর শরীর স্বাস্থ্য একবার ভেঙেছে, তারপর থেকে আর তেমন জুতসই হলো না শরীরটা। ওষুধ তো লেগেই আছে। উপসর্গের যেন আর শেষ নেই। অনেকদিন ভুগতে ভুগতে মেজাজটাও ওর কেমন খিটখিটে হয়ে গেছে। এরমধ্যে আবার প্লুরিসি হলো। এখন একটু ভাল। অসুখে অসুখে বেচারা একেবারে কাহিল।

কনকেরও এসব ভাবনা চিন্তায় শরীর মন ভাল থাকে না। ইদানীং তারও খাওয়া দাওয়ায় কোন রুচি ছিল না। খেতে পারে না। ইচ্ছেই করে না কিছু মুখে দিতে। সবসময়ই যেন পেটটা ভরে থাকে। এক ধরনের অস্বস্তি। হজমের গণ্ডগোল। ভাল ঘুম হয় না। মন-মেজাজ তারও তিরিক্ষি হয়ে থাকে। কলকাতার এই একঘেয়ে জীবন আর সহ্য হচ্ছিল না তার। ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছিল। এখানে এসে যেন সে বেঁচে গেল।

রোদে বারান্দা ভেসে যাচ্ছিল। সিঁড়ির মুখেই দুটো ঝাঁকড়া কামিনী-ফুলের গাছ। ওখানে খানিকটা ছায়া পড়েছে। কনক চেয়ারটা ওখানে টেনে নিয়ে গেল। দূরে পাহাড়। এখন আর কুয়াশা নেই। সামনে উঁচুনীচু টিলা। জমি, মাঠ, ঝিল। ঝিলের ধারে কিছু বক। ধানগাছে এখন পাকা রঙ ধরেছে। মাঠের বুকে যেন খুশির জোয়ার বইছে। হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। এখান থেকেই আশেপাশের কিছু বাড়িটাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাগান, ঝোপ-ঝাড়, গাছগাছালি সবই চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। নীল আকাশ। ঝকঝকে রোদ্দুর। রিঙ্কি বাগানের ভেতর খেলা করছে। মালী ওর হাতে বেছে বেছে কটা ফুল তুলে দিল। ভীষণ খুশি রিঙ্কি। মালীটা বেশ ভাল। নাম লালনজী। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। শক্ত সমর্থ চেহারা। মুখে বিনীত হাসি। বাগানের

বাড়তি গাছ ছেঁটে দিচ্ছিল লালনজী। কিছু ফড়িং আর প্রজাপতি উড়ছিল। চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে হালকা মেজাজে সামনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কনক এসব ছবিই দেখছিল। দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল সে।

ঝুনু চা নিয়ে এসে ওকে এরকমভাবে বসে থাকতে দেখে হাসল একটু। মৃদুভাবে একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই যে মশায়, তোমার চা।'

কনক তাকাল ওর দিকে। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিল।

ঝুনু চলে যাচ্ছিল। কনক ওর হাতটা টেনে ধরল। হাসল মৃদুভাবে, বলল, 'চললে কোথায়?'

'বারে, আমার আর কাজ আছে না?' ওর চোখেমুখেও নম্র ব্যস্ততা।

'আহা, একটু বসোই না এখানে।'

'বসে থাকলেই পেট ভরবে! কি বলবে তাড়াতাড়ি বলে ফেল।' বলে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে ঝুনু ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

কনক হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'এখানে অত তাড়াহুড়োর কি আছে! আমি তো আর নাকেমুখে কোনরকমে দুটো গুঁজেই অফিস ছুটছি না।'

'বেলা কত হয়েছে খেয়াল আছে?'

'যাঃ, মোটেও বেলা হয়নি।'

'খিদে পেলে কথাটা মনে থাকে যেন মশায়।' হাসল ঝুনু।

কনক চায়ে চুমুক দিল। সিগারেট ধরাল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'ভাবছি, আরো মাস দেড়েক এখানে থেকে গেলে কিরকম হয়।'

'তোমার অসুবিধে হবে না?'

'অসুবিধে আর কি, ছুটিটা বাড়িয়ে নিলেই হবে।'

ঝুনু খুশি হলো। হাসিমুখে বলল, 'তাই নাও, এমনিতে তো আর আসাটাসা হয় না।'

'ঠিক বলেছ, আমি কালই একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ঝুনু সামনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'রিক্সিটার খুব মজা হয়েছে দেখছি, সারাক্ষণই বাগানে ঘুরঘুর করছে। নিজের মনেই ঘুরেটুরে বেড়াচ্ছে।'

'কলকাতায় এত খোলামেলা জায়গা তো আর পায় না।'

'এই, আমি আর দাঁড়াব না, উনুনে মাংস চাপিয়ে এসেছি, তাও আবার মুরগীর মাংস।'

ঝুনু চলে গেল। কনক আস্তে আস্তে চা খাচ্ছিল। সিগারেট টানছিল। মাঝে মাঝে কেন যেন সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তার এখান থেকে অনেকগুলো বাড়ি দেখা যায়। প্রায় সব বাড়িতেই লোক এসে গেছে। রোদে পিঠ দিয়ে ওরা গল্প করছে, চা খাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে গান গাইছে। ছেলেমেয়েরা হুটোপাটি করছে। কোন কিছুর যেন তাড়া নেই। শ্যামলীভিলায় লোক এসেছে মাত্র চারদিন হলো। গাড়ি নিয়ে এসেছে ওরা। সব সময়ই ওখানে একটা হই হই চলছে যেন। গান-বাজনা হুল্লোড় চেঁচামেচিতে বাড়িটা আরো ঝকঝক করছে। বাড়ির সামনেই অনেকখানি ফাঁকা মতন জায়গা। ওখানে ব্যাডমিণ্টন খেলছিল দুজন যুবতী মেয়ে। পরনে ওদের কালো রঙের গরম প্যাণ্ট, গায়ে লাল মোটা গেঞ্জী। ফর্সা রঙ। কনক মাঝে মাঝে ওদের দেখছিল।

একটু দূরেই স্মৃতি লজ। ও বাড়িটা আবার বড় নিরিবিলি।

ওখানে স্বামী স্ত্রী দুজন মাত্র লোক থাকে। ওরা মাসখানেক হলো এখানে এসেছে। কনকদের সঙ্গে ওদের খুব আলাপ হয়ে গেছে। ওদের ওখানে কনকরা বেড়াতে গিয়েছে। ওরাও এসেছে। এখানে আসার পরদিনই আলাপ। দেখতে দেখতে আরো ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। দিনে একবার দুবার তো ওদের যাওয়া আসা হয়ই। কখনো কনক যায়। কখনো বা উমাশংকরবাবু আসেন। সকাল সন্ধ্যে একসঙ্গে বেড়ানো তো আছেই। উমাশংকরবাবু কলকাতায় লেকটাউনে থাকেন। ব্যাঙ্কে বড় চাকরি করেন। কিন্তু মনে কোন সুখ নেই। নিজে পেটের রোগে ভুগছেন অনেকদিন ধরে। ডাক্তার সন্দেহ করছে,

আলসার। অপারেশন ছাড়া আর কোন উপায় নেই। উমশংকরবাবু অপারেশন করতে কেন যেন একটু ভয় পান। তাঁর কেবলই ভয়, যদি অপারেশন করতে গিয়ে দেখা যায় যে আলসার নয়, ক্যানসার, তাহলে সবই তো শেষ হয়ে গেল মুহূর্তে। এরকম দুর্ঘটনা তাঁর দুজন বন্ধুর ক্ষেত্রেই হয়েছে। ভয়টা এজন্যেই আরো বেশী। এসব জায়গার জল-হাওয়া নাকি ভাল। কদিন ঘুরেটুরে একটু চাঙ্গা হয়ে নিতে চান। তার ওপর ওঁর স্ত্রীও অসুস্থ। মনে নানারকম জটিলতা শুরু হয়েছে। বেশী কথাটথা বলে না। থেকে থেকে কি যেন ভাবে। কখনো নিজের মনেই হাউ হাউ করে কাঁদে। রাগ হলে, কাপ ডিস গ্লাস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেলে। কথায় কথায় উমাশংকরবাবু কনককে সবই বলেছেন। বিয়ের বছর দুয়েক পরে একটি ছেলে হয়েছিল ওঁদের। মাত্র মাস তিনেক বেঁচেছিল শিশুটি। এরপর থেকেই নাকি আস্তে আস্তে কিরকম হয়ে গেল ওঁর স্ত্রী। আর কোন সন্তান হলো না আজো। অনেক ডাক্তার দেখানো হয়েছে। দুজনেরই নানারকম পরীক্ষা-টরীক্ষা হলো। কতরকম তুকতাক, টোটকা মাদুলী ঝাড়ফুঁক, কিছুই বাদ রাখেনি। উমাশংকরবাবু বলেন, কষ্টটা ওঁর চেয়ে ওঁর বউয়েরই বেশী।

অথচ কনক প্রথম যেদিন ভদ্রমহিলাকে দেখেছিল, একেবারে চমকে উঠেছিল। মুহূর্তে সে যেন কিরকম অপ্রস্তুত, বিব্রত হয়ে পড়েছিল। খানিকক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারেনি। বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠেছিল! এরকমই একজন মেয়েকে অনেকদিন আগে সে চিনত। প্রথমে ভেবেছিল, হয়তো সেই মেয়েই। কিন্তু মেয়েটির মধ্যে কোনরকম অস্থিরতা ছিল না। তার দিকে বড় বড় চোখ করে একটুক্ষণ তাকিয়েছিল মাত্র। তারপর অন্যদিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল। উমাশংকরবাবু নিজে থেকেই আলাপ করতে এলেন। প্রথম আলাপেই অনেক গল্পটল্প হলো। চা-টা খাওয়া হলো। ভদ্রমহিলা ঘুরে ঘুরে বাগানটাগান সব দেখল। রিঙ্কিকে খুব আদর করল। চলে যাওয়ার সময়ও ভদ্রমহিলা ঠোঁট

কেটে কেটে হাসছিল। কনকের মনে হলো, অবিকল এক চেহারা। অথচ ভদ্রমহিলা যে তাকে চিনতে পেরেছে, তা মনে হলো না। তবে কি এ অন্য কেউ? কোনদিনও কি কনকের সঙ্গে পরিচয় ছিল না? দীর্ঘশ্বাসে বুকের ভেতরটা তার ভারী হয়ে উঠেছে। একজনের চেহারার সঙ্গে আরেকজনের চেহারার এমন মিলও যে হতে পারে, কনকের তা জানা ছিল না। গলার স্বরটাও যেন একই রকম। পলারও টানা টানা চোখ। চোখের জমিতে ঘন, নেশা-নেশা এক আবেশ। পুরু ঠোঁট। পানপাতার মতন মুখের আদল। ঘন ভুরু। কনক লক্ষ্য করেছে, ভদ্রমহিলার নাকের কাছে একটা তিল। পলার নাকেও এরকম একটা তিল ছিল। আশ্চর্য! ভদ্রমহিলার স্বাস্থ্য একটু মোটা। পলা এরকম ছিল না। একটু ছিমছাম, কৃশ। তবু তার মনের মধ্যে এক খটকা লেগে থাকল। মুহূর্তে সব যেন অন্যরকম হয়ে গেল তার কাছে। পুরনো, পরিত্যক্ত কোন তারযন্ত্রে যেন ভুল করে আচমকা হাত লেগে গেলো। করুণ, বুকচাপা কান্নার মতন একটা সুর ছড়িয়ে গেল।

ওরা চলে যাওয়ার পরও কনকের সহজে ঘোর কাটেনি। সব যেন এলোমেলো করে দিয়ে গেল ওরা। বারান্দায় অনেকক্ষণ চুপচাপ করে কনক বসেছিল। ঝুনু ভেতরে ছিল। বাইরের মাঠ প্রান্তরে তখন মৃদু পায়ে অন্ধকার নামছিল। কুয়াশা ক্রমশই ঘন হচ্ছিল। জোনাকি জ্বলছিল নিবছিল। গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে কনক উদাসী চোখে অন্ধকার, আকাশ, মাটঘাট দেখছিল।

ওই ভদ্রমহিলা যেই হোক, পলার কথাটা তাকে আবার নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে গেল। কনক যেন অতি সাবধানে এই নামটাকে আজো বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। হয়তো সেখানে গভীর নিভৃত একটা অংশে এই নামটা চিরকালের মতন খোদাই করা আছে। এখনো মাঝে মাঝে দিনের সব কোলাহল যখন একেবারে ঢুলে পড়ে, যখন নিঝুম হয়ে আসে গোটা চরাচর, ঝুনু যখন হাঁ করে ঘুমোতে থাকে, এক উদাসী বিষণ্ণ হাওয়া যখন মাঠে প্রান্তরে কেবলই

মাথা কুটে মরে, তখন কনক কেন যেন ঘুমোতে পারে না। ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করে। চুপি চুপি একা একা এসে মনের সেই নিভৃত রাজ্যে ঢুকে পড়ে কনক। এ ছাড়া যেন আর কোন উপায় থাকে না তার। পলার সব কথা তখন এক এক করে তার মনে পড়ে যায়। একান্ত দুঃখীর মতন নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে মনে মনে সে বলে : পলা তোমার কথা তো আজো, আজো আমি ভুলতে পারিনি! জানি না, তুমি এখন কোথায় আছ, কিভাবে আছ, আমার কথা আদৌ তোমার আর মনে পড়ে কিনা ; কিন্তু আমার কাছে তুমি আজো বেঁচে আছ, বেঁচে থাকবে। তুমি আমার প্রেম, আমার জীবনের একই সঙ্গে মহৎ এবং করুণ অভিজ্ঞতা। তোমার কাছেই যে আমার ভালবাসার প্রথম অঙ্গীকার! হয়তো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার মুখ, তোমার কথা, স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে গাঁথা থাকবে। এ তো আর সবাইকে দেখাবার মতন নয়। মাঝে মাঝে নিজেকেই দেখা। এ আমার একান্তই নিজের জগৎ। একেবারে আলাদা, অন্যরকম। এখানে তুমি ছাড়া আর কারোরই প্রবেশের অধিকার নেই পলা!

এরপর ওদের সঙ্গে কনকদের অন্তরঙ্গতা আরো বেড়েছে। কনক প্রথম কদিন কেন যেন এক ধরনের তীব্র আবেগ বোধ করছিল। সে একরকম ধরেই নিয়েছিল, এই-ই পলা। মনের চোখ দিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে দেখেছে। না, তার ভুল হওয়ার কথা নয়! ও পলা না হয়ে যায় না। পরমুহূর্তেই আবার খটকা। কই, তাকে তো তখনো চিনতে পারছে না! তাই বা কি করে হয়! ও যদি পলাই হবে, তা হলে তো তাকে এর মধ্যে চিনেই ফেলত। পলা তাকে চিনবে না, এ হতেই পারে না। অথচ ওর হাবভাব বা কথাবার্তায় চেনার কোন লক্ষণ নেই। কনক একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, 'আপনার নামটা যেন কি?'

ভদ্রমহিলা চোখে চোখে চেয়ে হেসে ফেলেছিল। ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে কৌতুকের গলায় পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, কেন বলুন তো?

'এমনি। আপনাকে আমার ভীষণ চেনা চেনা লাগছে।' হাসছিল কনক।

'ও-মা, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, অবিকল আপনার মতন দেখতে।'

'বারে, আমার নাম তো কাবেরী।' বলেই ফিক করে হেসে ফেলল। মনে মনে কি যেন ভাবল একটুসময়। আনত ভঙ্গিতে দাঁতে নখ কাটল খানিকক্ষণ। কি ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আবার তাকাল ওর মুখের দিকে। টলটলে চোখ। এবার আর হাসল না। আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার চেনা নামের সঙ্গে বোধহয় মিলল না, না?' গলার স্বরটা হঠাৎ একটু কেঁপে গেল। মুখের ওপর আবছা এক চিলতে ছায়া তিরতির করছে।

কনক আমতা আমতা করে বলেছিল, 'না।' সেও যেন সামান্য মনমরা হয়ে যায়। সে যা ভেবে রেখেছিল, তা মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে গেল। কি ভেবে আবার সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনারা কি কখনো দেওঘরে ছিলেন?'

'না তো!' এবার ওকে একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

'তাহলে আমারই ভুল হচ্ছে।' কনক হালকা গলায় হাসে।

কনক অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। গলার কাছে তার কি যেন একটা আটকে আছে। বুকের ভেতরে কষ্ট। মাঝে মাঝে তার কেন যে এমন হয়! এ কষ্টের কথাটা কাউকেই সে বলতে পারে না। উত্তুরে হাওয়া ছুটে যাচ্ছে মাঠ প্রান্তর বাগান ঝিলের ওপর দিয়ে। গাছের পাতা কাঁপছে। সিরসির শব্দ। কনকের চোখেমুখে এক ঘোর।

উমাশংকরবাবু যে কখন গেট খুলে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, টের পায়নি কনক। তিনি হাসছিলেন। একটু পরে বললেন, 'এমন করে কি এত ভাবছেন?'

'আরে আপনি, বসুন।' উঠে দাঁড়াল কনক।

'আচ্ছা লোক তো আপনি! দেখছেন হাতে বাজার, তার চেয়ে

আমাদের ওখানে চলুন, বসে বসে গল্প করা যাবে।' বলে উমাশংকর-বাবু মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন!

কনক বলল, 'একটু চা খেয়ে গেলে হতো না?'

উমাশংকরবাবু এবার ওর চাদরে মৃদু টান দিয়ে বললেন, 'আগে চলুন তো আপনি। চা-টা আমার ওখানেই হবে।' বলেই হাঁটতে লাগলেন।

'চলুন।' কনকও এগিয়ে গেল। ক' পা গিয়েই কি ভেবে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। রিঙ্কিকে কাছে ডাকল। মেয়ে দৌড়তে দৌড়তে এল। ওর মুখের ওপর গুচ্ছের চুল। একটু হাঁপাচ্ছিল। কনক ওর মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে আদর করে বলল, 'তুমি মা সময় মতন চানটানটা করে নিও। আর মাকে বলবে, আমি তোমার শংকরকাকুর ওখানে যাচ্ছি।'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব বাপী!'

'এখন নয় মা, বিকেলে তো আবার আমরা বেড়াতে বেরোবই।'

রিঙ্কি চলে গেল। কনকও আর দাঁড়াল না।

উমাশংকরবাবু যেতে যেতে হঠাৎ বললেন, 'বুঝলেন কনকবাবু, সংসারটা বড় আজব জায়গা।'

'হঠাৎ এসব দর্শনটর্শন, কি ব্যাপার?' হালকা গলায় হাসল কনক।

'আর বলেন কেন, দু-এক দিনের মধ্যেই আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'সে কি?' কনকের চোখেমুখে বিস্ময়। সে অবাক চোখে চেয়ে থাকল ওঁর মুখের দিকে। এরকম একটা খবরের জন্যে সেও তৈরি ছিল না।

উমাশংকরবাবু মৃদুগলায় বললেন, 'হ্যাঁ, কোন উপায় নেই আমার।'

'বলেন কি, আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

'সত্যি কথা বলতে কি, জায়গাটা আমারও বেশ ভাল লেগেছে। ইচ্ছে ছিল আরো কিছুদিন থেকে যাই। তা আর হলো না। হঠাৎ

যে কি হলো কাবেরীর! ও একবার যা বলবে, তার আর নড়ন চড়ন নেই। এই তো আমার সমস্যা।'

'আপনারা চলে গেলে যে আমাদেরও খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। বুঝিয়ে বলুন না!'

উমাশংকরবাবু হাসলেন ম্লানভাবে। বললেন, 'এ বোঝাবার কেস নয় কনকবাবু। আমি তো আমার বউকে চিনি। ও এরকমই, একবার যখন মাথার পোকা নড়ে উঠেছে, তখন আর কোন উপায় নেই, যেতেই হবে। হঠাৎ যে কেন এমন হলো বুঝতে পারলাম না।' সামান্য বিমর্ষ, আহত মনে হলো ওঁকে।

কনকেরও কেন যেন মনটা ভারী হয়ে ওঠে। অল্প ক'দিনের পরিচয়। তবু ওরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তার কাছে। কাল বিকেলেও তো ওরা একসঙ্গে নদীর দিকে বেড়াতে গিয়েছিল। জায়গাটা খুব সুন্দর। কত গল্প, হাসাহাসি। পথের দু'পাশে ঢালু ক্ষেত। মাঠ থেকে ধানের নেশা নেশা গন্ধ উঠে আসছিল। গাছে গাছে পাখির কিচিরমিচির। ধুলো উড়ছিল মাঝে মাঝে। ভদ্রমহিলাকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল। খোঁপায় ফুল ছিল। ওরা যখন ঘরের পথ ধরেছে, তখন মাঠের ওপর থেকে শেষ আলোটুকুও ফুরিয়ে গেছে। আবছা অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশার বুনন চলছে। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। মাঠেঘাটে জোছনার জোয়ার। কনক একটুও বুঝতে পারেনি যে ওরা আজকালের মধ্যেই চলে যাবে। থেকে থেকে তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ির কাছে চলে এসেছে। উমাশংকরবাবু গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। কনক পেছনে পেছনে এল।

বারান্দায় গোটা দুয়েক চেয়ার পাতা। রোদ সবে চেয়ারগুলোর মাথা ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। কনক একটা চেয়ার টেনে নিল।

উমাশংকরবাবুর শব্দ পেয়ে কাবেরী বেরিয়ে এসেছে। কনককে দেখে হেসে ফেলে শুধলো, 'আপনি কখন এলেন?'

'এই মাত্তর। চা খেতে এলাম।' কনকও হেসে ফেলেছে।

কাবেরী খিলখিল করে হাসল আবার, বলল, 'খুব ভাল করেছেন।'

উমাশংকরবাবু বাজারের থলেটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'চায়ের সঙ্গে তেলেভাজাটাজা না হলে ঠিক জমে না।'

'আবার তেলেভাজার নাম করছ তুমি?'

'খুড়ি, আমার ভুল হয়ে গেছে।' উমাশংকরবাবু মজা করে করে হাসলেন।

'খুব ইয়ার্কি হচ্ছে, না?' কাবেরী ভেতরে চলে গেল।

উমাশংকরবাবুও চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। সিগারেট ধরালেন। কনকও ধরাল। শুকনো হাওয়া ছোটাছুটি করছে। সামনের রাস্তা বাড়ি ছাড়িয়ে দূরের গাছ, ঘন ঝোপ, পাহাড়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে উমাশংকরবাবু কি যেন ভাবছিলেন। আস্তে আস্তে সিগারেট টানছিলেন। হঠাৎ দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে তিনি কনকের চোখে চোখে চাইলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'ওই দূরের পাহাড়টার কাছে যাওয়া যায় না?'

কনক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। সিগারেটে টান দিয়ে বলল, 'ওর কাছে গেলে কি আর সেই চার্ম থাকবে। তার চেয়ে এই তো ভাল।'

উমাশংকরবাবু আবার চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। উদাসী, বিষণ্ণ এক দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকলেন দূরের দিকে।

কনক একটু অবাক হলো। মাঝে মাঝে তারও তো এরকম হয়। তবে কি, ওঁর বুকের গভীরেও না-বলা কোন দুঃখ জমে আছে? সংসারে সবার মধ্যেই কি এরকম কিছু কিছু একান্ত গোপন দুঃখ লুকোনো থাকে? এই কষ্ট বুকে নিয়েই কি মানুষকে চিরকালের মতন চলে যেতে হয়? একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার।

একটু পরে কাবেরী চা বেগুনী নিয়ে এল।

উমাশংকরবাবু আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'সাবাস কাবেরী।' বলেই একটা বেগুনী তুলে নিলেন বাটি থেকে।

'তুমি না ভীষণ লোভী।' পরে কনকের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না, নিন।'

কনক বেগুনী খেতে খেতে বলল, 'আপনিই বা বাকি থাকছেন কেন, নিন।'

'দাঁড়ান, আমার চা-টা আগে নিয়ে আসি।' বলেই চলে গেল।

একটু পরে আবার ফিরে এল কাবেরী। হাতে চায়ের কাপ। সেও একটা বেগুনী তুলে নিল।

ওরা চা খেতে খেতে আরো খানিকক্ষণ গল্পটল্প করল। একসময় উমাশংকরবাবু বললেন, 'আমি একটু আসছি, আপনারা গল্প করুন।'

কাবেরী মুখ টিপে একটু হাসল।

কনক সিগারেটে আরো কয়েকটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিল। চায়ে চুমুক দিল। পরে কাবেরীর মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হেসে বলল, 'আপনারা নাকি চলে যাচ্ছেন?'

কাবেরীও হাসল। চোখ টান টান করে শুধলো, 'কে বলল আপনাকে?'

'যেই বলুক, কথাটা সত্যি কিনা বলুন?'

কাবেরী চুপ করে থাকল একটুসময়। সামনের দিকে তাকাল। তারও মুখের ওপর এই মুহূর্তে মলিন একটা ছায়া তিরতির করছে। কি ভেবে দৃষ্টিটা আবার ঘুরিয়ে আনল। কনকের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে আস্তে আস্তে বলল, 'ঠিকই শুনেছেন, আমরা কালকেই চলে যাচ্ছি।' কথাটা বলার সময় ওরও গলাটা যেন সামান্য কেঁপে গেল।

'এত তাড়াতাড়ি যে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, বুঝতেই পারিনি।'

কাবেরী এবার দৃষ্টি আনত রেখে অস্ফুট গলায় বলল, 'আমি নিজেই কি বুঝতে পেরেছি ছাই। ও আপনি বুঝবেন না।' বলতে গিয়ে মনে হলো গলাটা যেন ধরে এল। কাবেরী উঠে পড়ল। ভেতরে চলে গেল ও।

একটু পরে উমাশংকরবাবু এলেন। সিগারেট ধরালেন। আবার

গল্প শুরু করলেন। এবার আর জমল না তেমন। সুরটা কেমন যেন কেটে গেছে।

কনকও উঠে পড়ল একসময়। বেলা হয়েছে।

উমাশংকরবাবু কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। কনক ওঁদের সঙ্গে স্টেশনে এসেছে। আর সামান্য পরেই ট্রেন আসবে। ভদ্রমহিলাকে এই মুহূর্তে কেন যেন খুব মনমরা দেখাচ্ছে। একটু বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক। দু-একবার কনকের মুখের দিকে এমন করুণ চোখে চেয়ে থেকেছে যে কনকেরই লজ্জা হয়েছে। অন্যদিকে সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। ভদ্রমহিলা একসময় বিমর্ষ গলায় বলল, 'রিঙ্কিকে আনলে পারতেন।'

'ও এলে খুব কান্নাকাটি করত।'

ভদ্রমহিলার চোখ দুটো যেন এবার ছলছল করছে। খানিকক্ষণ আর কোন কথা বলতে পারল না। মুখের ওপর মলিন এক ছায়া কাঁপছে।

কনক ধীরে ধীরে বলল, 'আপনারা তো চলে যাচ্ছেন, আমাদের খুব খারাপ লাগবে।'

ভদ্রমহিলা একপলক কনকের মুখের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই দৃষ্টি আনত করল। ম্লান, একটুকরো হাসি মুখের ওপর ফুটেই মিলিয়ে গেল। সামান্য চাপা গলায় বলল, 'দুদিন, তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

উমাশংকরবাবু বললেন, 'বেশ কাটল কটা দিন।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। যাত্রীদের মধ্যে ব্যস্ততা বাড়ছে। ট্রেন আসার সময় হয়ে এল। খানিক পরে কনক ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওরও বুকের ভেতরে কেন যেন অকারণ এক কষ্ট। পরে একটু ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাদের কথা তো একেবারেই ভুলে যাবেন।'

'ভুলবই তো, সবাই ভুলে যাবে।' ওর চোখের কোলে কি গভীর

এক রহস্য ফুটে ওঠে। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। গলার স্বর কেঁপে যায়।

কনক চমকে ওঠে। এরকম চাউনি তো সে আর একজনের চোখেই দেখেছিল। কনকের বুকের গভীরে আজো সে এক ছবি হয়ে আছে। কি যেন সে একটা বলতে গেল। বলা হলো না।

এমন সময় ট্রেন এলো। লোকের চেঁচামেচি বাড়ল। ঠেলাঠেলি, চিৎকার। সবাই ফিরে যাচ্ছে। উমাশংকরবাবুরাও উঠলেন। কনক নিচে একটা কামরার জানালার কাছে দাঁড়াল। ওরা জানালার কাছেই বসবার জায়গা পেয়েছে। কনকের কেন যেন খুব কষ্ট হচ্ছিল এখন। উমাশংকরবাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখা করবেন কিন্তু।'

ট্রেন ছাড়বার ঘন্টি পড়ল। কাবেরীর মুখে হাসি নেই। ওর চোখমুখ যেন বিষণ্ণতায় ভিজে গেছে। কনকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখ ছল ছল। উমাশংকরবাবু একটু ভেতরের দিকে। মালপত্তর ঠিকঠাক করে রাখছেন। গার্ডের হুইসেল বাজল। নীল আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে।

কনকের হাতটা জানলার রেলিংয়ের ওপর। হঠাৎ কাবেরী ওর হাতটা চেপে ধরল। চোখে জল। কোনরকমে অস্ফুট গলায় শুধু বলল, 'আমি তোমাকে দেখামাত্রই চিনেছিলাম .কনকদা। সেজন্যেই আর…' কথা শেষ হলো না। ট্রেন ছেড়ে দিল।

সমুদ্রের কাছে

পরিকল্পনাটা গণেশের। ওরা তিনজনেই, গণেশ, কেষ্ট আর মদন একদিন স্কুলের সহপাঠী ছিল। ওখান থেকেই ওদের বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা। গণেশ ওর মামারবাড়ি থেকে পড়াশুনো করেছে। মামার অবস্থা খুবই ভাল। গণেশের সঙ্গে ওরাও কখনো সখনো ওই বাড়ির ভেতরে গেছে। বাগরী মার্কেটে ওর মামার ওষুধের বিরাট দোকান। ওতেই এত পয়সা। পাস করে কলেজেও ভর্তি হয়েছিল গণেশ। ক'দিন যেতে না-যেতেই আবার ছেড়ে দিয়েছে। ওর যুক্তি হলো, 'পড়াশুনো করে আর কি হয়, মামার বিজনেসেই ঢুকে পড়ব এবার।' এরপর সত্যসত্যই একদিন ওষুধের ব্যবসায় লেগে গেল গণেশ। তারপরও ওর সঙ্গে মদনের কেষ্টর দেখা হয়েছে। এতে অন্তরঙ্গতা, যা সচরাচর দেখা যায় না, আরো বেড়েছে, কমেনি। গণেশ এখন প্রচুর পয়সা করেছে, মামা গত হয়েছে। বলতে গেলে, সে-ই এখন আসল মালিক। তবে ওর চেহারায়, চোখের কোলে কিছুটা সাংসারিক জটিলতার ছাপ ফুটে উঠেছে। বিষয়ী মানুষ হলে সাধারণতঃ যা হয়! মনের সুখ এতে কমেছে, দুশ্চিন্তা বেড়েছে।

আই. এ. পাস করে মদনও একদিন পড়াশুনো ছেড়ে দিল। ওর বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য। কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিল না তখন। বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়েছিল। পাঁচ ছ' বছর পর আবার একদিন, একেবারে আচমকাই এসে হাজির হয়েছে। ততদিনে তার বাবাও মারা গেছে। শেষের দিকে পারিবারিক অনেক অশান্তি, কষ্ট নিয়ে নাকি তার বাবা একটু তাড়াতাড়িই চলে গেল। মদন তখন একটা অফিসে কাজ করে।

কেষ্টই শেষ পর্যন্ত পড়াশুনোটা চালিয়ে গেছে, বি. এ. পাস করেছে। ওর মুখটা সবসময়ই কেমন বেজার হয়ে থাকত। জিজ্ঞেস

করলে বলত, 'বাড়িতে অসুখ।' ওর দেশ ছিল বাঁকুড়ায়। কেষ্ট কলকাতায় ওর দাদার কাছে থেকে পড়াশুনো করেছে। পাস করে গ্রামেই ফিরে গেছে সে। একটা স্কুলে কাজ করে এখন। মনের দিক থেকে দিন দিনই কেমন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছিল ও। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসে। এলে অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়। কেষ্ট কি এক কাজে তখন কলকাতায় এসেছে। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলো। কথায় কথায় একসময় সমুদ্র দেখার কথাও উঠল। গণেশই কপিলাশ্রমের কথা বলেছে। সকলেই তাতে রাজী হয়ে গেল। আসলে ওরাও অনুভব করছিল, ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে মনের ওপর যেন কেমন মরচে পড়ে যাচ্ছে ওদের। সংসারের একঘেয়েমি আর ভাল লাগছিল না। মোটের ওপর, তিন বন্ধুতে মিলে অনেক দিন পর একটু ফুর্তি করা।

ওরা যখন এসে পৌঁছলো এখানে, সূর্য তখন আরো ঢলে পড়েছে। পথে আসতে আসতে সারাক্ষণ এলোমেলো বাতাস আর রোদ্দুর খেয়েছে ওরা, সঙ্গে প্রচুর ধুলোবালি, খড়কুটো। মাথায় শরীরে সেই বালি ময়লা, ঘামের সঙ্গে মাখামাখি হয়েছিল অনেকক্ষণ। একটা অস্বস্তি। বালির দানাগুলো কিরকির করছিল।

সময়টা চৈত্রের শেষ। এলোমেলো বাতাস। শুকনো পাতা, ঝরা মুকুল, বালিটালি মিলে মিশে অনেকক্ষণ থেকেই ছোট ছোট বৃত্ত রচনা করছিল। বিষণ্ণ ক্লান্ত রোদ্দুরের মধ্যে বাতাসের সঙ্গে তারা উড়ছিল। কী এক নেশা যেন সর্বত্র ছড়ানো। এর মধ্যেই ওরা জিরিয়ে নিল। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করল। আকাশে লালের সমারোহ দেখল। যেন সত্য কেউ আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে সেখানে। পাখিদের দল বেঁধে ঘরের পথ ধরা, কূজন, আমের মুকুলে মৌমাছিদের ভিড়, সব কিছুই কেমন আবেশ-মাখা চোখ নিয়ে ওরা দেখেছে। সূর্য ডুবল। আবছা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে একসময় ওরা সমুদ্রের খুব কাছাকাছি, বালির ওপর শতরঞ্জি বিছিয়ে, হাত পা ছড়িয়ে গোল হয়ে বসল। ঢিলেঢালা, অলস ভঙ্গি। সামান্য পরে সমুদ্রের ভেতর থেকে

চাঁদটা উঠে এল। দেখতে দেখতে অন্ধকার কেটে গেল। নরম আলোয় সব ভরে উঠছে। সেই জোছনা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে ফুটছে। মলিন ভাবটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল। ফুটফুটে আলোয় জায়গাটা এখন ভেসে যাচ্ছে। ঢেউগুলোও আলোয় মাখামাখি হওয়ার জন্যে এখন খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। বিস্তৃত বেলাভূমিকে জোছনা-মাখা সমুদ্র বলে ভুল হয়। বাতাস এখন আরো জোর পেয়েছে। বালি উড়ছে। সমুদ্রের গর্জন ক্রমশই বাড়ছে। ঝাউবনের চেহারাটা এখান থেকে কেমন যেন এক অস্পষ্ট, ধূসর মায়ালোক বলে মনে হচ্ছিল।

ওরা সিগারেট ধরাতে গিয়ে পর পর কয়েকটা কাঠি নষ্ট করল। তারপর নীচু হয়ে উল্টো দিকে মুখ নিয়ে প্রথমে গণেশই সিগারেট ধরিয়েছে। পরে ওরাও একে একে ধরাল।

সিগারেট টানতে টানতে মদন এক ফাঁকে বলল, 'আজ তা হলে এখানেই রাত্রিবাস?'

'কেন, তোর ভয় করছে নাকি?'

'মোটেই না।' সিগারেটে জোরে জোরে ক'টা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তোর ওই বিলিতীটা একবার সামনে রাখ না দোস্ত, রাখলেই দেখবি ওসব ভয়ফয়, ম্যাজম্যাজ ভাব কোথায় পালিয়েছে।'

'ধীরে বন্ধু, ধীরে। রাখবার জন্যেই তো আনা।' গণেশও ধোঁয়া গিলতে গিলতে গভীর আবেগ নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে একটুসময়। পরে বলল, 'মাইরি দেখ, সমুদ্রের বাহারটা একবার দেখ শুধু।' একটু থেমে আবার আস্তে আস্তে গণেশ বলে, 'বুঝলি, এমন সমুদ্র, চাঁদের আলো হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু এই নির্জনতা? এর টানটাই আমার কাছে বেশী ছিল।'

'আহা, এর আর তুলনা নেই মাইরি, তুলনা নেই।' কেষ্টর গলায় আবেগ। চোখেমুখে মুগ্ধতা আর বিস্ময়ের ছড়াছড়ি।

'এমন চাঁদের আলোয় মরি যদি সেও ভাল।' গণেশ গুনগুন করে ওঠে।

'আমার যে ভাই মরে যেতে ইচ্ছে করছে!' মদন নাকী সুরে বলল।

'ঠিক আছে, পরে মরিস, আগে দেখে-টেখে নে, এসব তো ভুলেই গেছি।'

'আমার শালা এখনই মা কালী হয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে রে।'

'নাচ না, কে বারণ করছে তোকে, মা কালীই হ, আর বাবা ভোলানাথই হ, এখানে কেউ দেখতে আসছে না।'

মুহূর্তের মধ্যে মদন উঠে দাঁড়িয়েছে। বোঁ করে এক চক্কর পাক খেয়ে নাচের ঢঙে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে অঙ্গ দুলিয়ে হাতমুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে সুর করে গাইল, 'কে বিদেশী মন উদাসী।' আবার বসে পড়েছে মদন।

ওরা তিনজনই হাসিতে ফেটে পড়ল। কি আশ্চর্য, সমুদ্রের দামাল বাতাস এসে মুহূর্তের মধ্যে শব্দগুলো কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

কেষ্টর মুখে তখনো সামান্য হাসি লেগে রয়েছে, বলল, 'যা একখানা দেখালি না মাইরি, উর্বশী মেনকাও হার মানে।'

'সবই জায়গার গুণ।'

'পেটে না পড়তেই এই, পড়লে দেখছি মা কালীই হতে হবে আজ।'

'তাই হব, নাচব, চেঁচাব। আমাদের যা খুশি আজ করতে পারি, কেউ বলনেওলা নেই, আমরাই এখানকার অল ইন অল।'

কেষ্ট যেন কি ভাবছিল। পরে মুখ তুলে বলল, 'অনেক দিন পর আবার সব ভাল লাগছে। সংসারটা আমায় একটু একটু করে মেরে ফেলছিল। খুব ফাঁকা, ফ্রি লাগছে এখন।'

'ক'দিন ধ'রে আমারও আর কিছু ভাল লাগছিল না, মন বসাতে পারছিলাম না। আমার মামাকে খালি স্বপ্ন দেখছি।' গণেশ যেন মুহূর্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

'ওসব স্বপ্নটপ্ন বড় বাজে জিনিস রে, কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। একসময় আমাকেও পাগল করার দশা করেছিল।' সামান্য সময় চুপ

করে থেকে মদন কি ভেবে নিল যেন। আবার বলল, 'এখানে এসে আমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা যেন হঠাৎ কমে গেছে।'

গণেশ এবার মুচকি হাসল, 'জায়গাটা তাহলে কিরকম একবার বেছেছি বল!'

'সে আর বলতে, সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল।'

'তুই না বললে তো আমরা এখানে আসতামই না।'

'দেখেছিস, লোকের ফালতু হ্যাংলামিটা এখানে নেই।'

'সেইজন্যেই তো আসা রে; লোকজনের ভিড় আমার আর একদম ভাল লাগছিল না!' গণেশ আরো কি যেন ভাবছিল তখন।

মদন আবার একটা সিগারেট ধরাল। খানিকটা ধোঁয়া গিলে নিয়ে বাকিটা নাক মুখ দিয়ে বের করে দিতে দিতে হাসল একটু। হেসে বলল, 'এর আর একটা দিকও আছে।'

ওরা একদৃষ্টে মদনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মদন সিগারেটের টুকরোটা ঠোঁটের ডগায় ছুঁইয়ে রেখেছে। ছোট করে একটা ঢেঁকুর তুলল। ওদের চোখের দিকে চাইতে চাইতে শেষে বলল, 'সমুদ্রকে সমুদ্র, তার সঙ্গে আবার ফাউ, ছিঁটেফোঁটা পুণ্যি; এটা কিন্তু আমাদের এক্সট্রা লাভ।' মদন এবার জোরে জোরে হাসল।

'কি আমার পুণ্যিওলারে! আমাদের পুণ্যি ওই যে গণশার ব্যাগটা দেখছিস, ওখানে।' কেষ্ট চোখ পিটপিট করে হাসে।

'তুই কী রে মাইরি! জানিস না তো, এখানে এলে সব তীর্থের ফল হয়। এর জলে একবার ডুব দিলে নাকি সব পাপটাপ ধুয়েমুছে যায়!' বোঝা গেল না, মদনের গলায় কোন রহস্য ছিল কিনা।

'আমরা তো তাহলে ঠিক জায়গায়ই এসে পড়েছি।' গণেশ মুহূর্তে একটু অন্যমনস্ক হয়।

'ঠিক জায়গাই বটে!' কেষ্ট হাসল। কি ভেবে পরক্ষণেই শুধলো, 'আমরা এখন কোথায় আছি বল তো!'

'কোথায় আবার, কপিলাশ্রমে, একেবারে সমুদ্রের মুখোমুখি!' মদন তাকাল ওর মুখের দিকে।

'ছাই, এটা আসলে পাতাল।'

'পাতাল?' গণেশ অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা সেই পাতাল।' একটু চুপ করে থেকে আবার কেষ্ট বলে, 'দেখলি না, মন্দিরে কপিলমুনি, ভগীরথ, গঙ্গা, অশ্বমেধ যজ্ঞের সেই ঘোড়াটা; এগুলোরই মূর্তি!'

'এখানেই তো সগররাজার ছেলেগুলো মরে ছাই হয়ে গিয়েছিল, তাই না?' মদন চোখ তুলে চাইল একবার।

'সোজা কথা, ষাট হাজার ছেলে!' কেষ্ট চোখ বড় বড় করে তাকায়।

'ওই ইন্দ্রটা মাইরি পয়লা নম্বরের হারামি। ও-ই তো যজ্ঞের ঘোড়াটা চুরি করে এনে এখানে রেখে দিয়েছিল! মাঝখান থেকে বেঘোরে এতগুলো ছেলের প্রাণ গেল।' ওদের জন্যে মদনের যেন খুব কষ্ট হচ্ছিল।

'একটা জিনিস ভুল করছিস, আসল গল্পটা কিন্তু এখানে নয়; ওটা গল্পের ওপরের অংশ, ভেতরটা অন্যরকম।' কেষ্ট ধীরে ধীরে কথাগুলো বলে কি ভাবল নীরবে।

'সেরেফ গ্যাঁজা।' গণেশ হাঃ হাঃ করে হাসল।

'প্রথমে অবিশ্যি তাই মনে হয়।' কেষ্ট ওদের মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসে। একটু পরে বলল, 'একটা কথা তুই ভাব, ষাট হাজার ছেলে, কখনো তা সম্ভব? শুধু তাই নয়, ওরা ঘুরতে ঘুরতে কিনা শেষে এই পাতালে এসে হাজির!' কেষ্ট একটা সিগারেট ধরাল আবার। জোরে জোরে কয়েকটা টান মেরে হাসল। বলল, 'বুঝলি, ওই ঘোড়াটাই সব কিছুর মূল। গল্পের খাতিরেই ওটা এসেছে। আমারও প্রথমটায় মনে হয়েছে, একটা ঘোড়াকে নিয়ে এত বড় একটা কাণ্ড, কিরকম ঘোড়া! পরে ভেবে ভেবে আমি এর একটা অর্থ বের করেছি। আসলে, ঘোড়াটা একটা প্রতীক মাত্র। আমার মনে হয়েছে, ওটা আমাদের কাছে যাবতীয় স্থূল লোভের, ভোগের বস্তু। ওর জন্যেই শেষ পর্যন্ত আমাদের নরকে যেতে হয়। আর নরক মানেই

তো পাতাল ; আর এখানেই আমাদের মৃত্যু। এই চাওয়ার কখনো শেষ নেই। এমনি করেই আমরা এক বড় পাপের মধ্যে ডুবে যাই, হয়তো ফেরা যায় না ওখান থেকে।' একটু চুপ করে থেকে কেষ্ট আবার বলল, 'আমার তো মনে হয়, গপ্পটা আমাদেরই গপ্প, ইন্দ্র বেচারীর আর দোষ কি, ও একটু মজা করতে চেয়েছিল।' কেষ্ট এবার হাসল।

ওর কথা শুনে মদন হো হো করে হেসে উঠেছে। গণেশ হাসতে গিয়েও হাসল না। বলল, 'দারুণ একখানা দিয়েছিস তো।' কিছু-ক্ষণ চুপ করে থেকে পরে বলল, 'আমার ভাবতেই এখন গা কেমন ছমছম করছে রে, আমরা তাহলে পাতালে!'

মদন রগুড়ে গলায় বলল, 'পাতালটা তাহলে এখানে ছিল না ভাই।'

'পাতালই দেখছি আমাদের আসল জায়গা!' গণেশ কি ভেবে যেন হাসল। ওর গলায় মনে হলো আরো কী রহস্য ছিল। আবার সিগারেট ধরায় সে। ধোঁয়া ছেড়ে একটু লঘুভাবে বলল, 'জানিস তো, এখানে এলে কিছু একটা দিতে হয়!'

'সে তো মেলার সময়।'

'তার কোন মানে নেই।'

মদন কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। হাতের মুঠোয় বালি নিয়ে সামনের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছিল। একটু পরে উঠে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে এবার চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'ওসব দেওয়া-ফেওয়ার মধ্যে নেই, সব জায়গায়ই মাইরি ঘুষের কারবার।'

কেষ্ট যেন তখন গভীরভাবে কী ভাবছিল। বলল, 'কি দেব, দেওয়ার মতন তো আনিনি কিছু।' তার কণ্ঠস্বর কেমন ক্ষীণ শোনাল।

মদন সোজা হয়ে উঠে বসেছে। গণেশের মুখের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, 'ওসব আজেবাজে কথা ছাড় তো, তোর ওই বোতল বের করবি কিনা আগে বল।'

'সবে তো সন্ধ্যে, আর একটু রাত হোক !'

'ধ্যাৎ—!' মদন সটান উঠে এসে ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করে নিয়ে এসে সামনে রাখল, 'পেটে না পড়লে কি আর রসের কথা বেরোয় !'

হাত বাড়িয়ে গ্লাসগুলো বের করে আনে গণেশ। বোতলের মুখটা খুলে ফেলেছে সে। তিনটে গ্লাসেই সে হুইস্কি ঢালল। জল মিশিয়ে নিল খানিকটা করে। তিনজনই এবার সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসেছে। ভয়ঙ্কর এই সমুদ্র, গর্জন, বাতাস ; জোছনা ওদের মনের ভেতরে একটু একটু করে তখন নতুন এক নেশা বিস্তার করছে। ওরা চুপচাপ নেশা করছিল।

একটু পরে খেয়াল হলো, ওরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলেনি। সামান্য নড়েচড়ে বসল। পরে গণেশই সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'নাঃ, এভাবে চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছে না, কিছু কথাটথা বল তোরা।'

'কথাগুলোরও তো ক্লান্তিটান্তি আছে, তখন থেকে তো সমানে বকবক করেই চলেছি।'

'সবে তো সন্ধ্যে সাতটা, মনে আছে, সারা রাত্তির এখানে কাটাতে হবে !'

'এক কাজ করলে তো হয়।'

'যেমন ?'

'যেমন, এসব কথায়-ফতায় কিছু হবে না ; তার চেয়ে আমাদের তিনজনকেই একটা একটা করে গপ্প বলতে হবে, এই করতে করতেই রাত কাবার হয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছিস তো।'

'কে আগে শুরু করবে শুনি !'

'করলেই হয় একজনকে, সবাইকেই তো বলতে হবে।'

'তা হলে গণেশই আগে শুরু কর।'

ওরা আবার কিছু সময় নীরব থাকল। যেখানটায় ওরা বসেছে,

তার ক'হাত দূরেই সমুদ্র। কিছুক্ষণ অনিমেষে ওরা এই অশান্ত সমুদ্রকে দেখল। মনে হচ্ছিল, এখানেই যেন ওরা বহু বছর ধরে বসে আছে, আরো অনেককাল এইভাবেই বসে থাকবে। সমুদ্র যেন ওদের আর উঠতে দেবে না এখান থেকে। একটু অবাধ্য হয়েছে কি, অমনি বুঝি হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে ভেতরে। সারাক্ষণ ওদের ওপর সমুদ্রের সতর্ক দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে। আবার কখনো মনে হয়েছে, কোন এক শক্তিমান জাদুকরের সামনে এসে পড়েছে ওরা। সম্মোহনের জালে আটকা পড়ে গেছে। ফেরার আর উপায় নেই। নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদাবোধ সব যেন একটু একটু করে কেমন হারিয়ে ফেলছে। কেমন অবশ, আলগা হয়ে আসছে সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল গণেশের। এ কি! ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। কি গল্প সে আজ বলবে এখানে! অনেক কিছুই যেন মনের অতল থেকে সহসা উঠে আসতে চাইছে। এর মধ্যেও গণেশের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। এসব কথা তো সে বলতে চায় না! তবু বারবার কেন তা মনে পড়ে যাচ্ছে! গ্লাসে চুমুক দিয়ে গণেশ আর একবার ভাবতে চেয়েছে। বহুকাল ধরে যেন সে এদের কোন এক গোপন নিভৃত কক্ষে বন্ধ করে রেখেছিল। চাবিটা এতকাল তার হাতেই ছিল। আজ দেখল, সেটা সামনের এই শক্তিমান জাদুকরের হাতে। অদ্ভুত খেলা তো!

গণেশের কপালে ভাঁজ পড়ল। আরো কয়েকবার ঘন ঘন গ্লাসে চুমুক দিল। সিগারেট ধরাতে গিয়ে টের পেল হাতটা তার কাঁপছে। চারপাশে এক ঝিমঝিম নেশা যেন ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। ধোঁয়া গিলতে গিলতে একসময় কাঁপা কাঁপা গলায় ও বলল, 'আমিই তাহলে শুরু করছি।' আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। মনে হচ্ছিল, গল্পটা যেন ও মনে মনে শেষবারের মতন আর একবার সাজিয়ে নিচ্ছে। গণেশ একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে। সে যেন এখন আরো গভীরে তলিয়ে গেছে। একটু পরে গণেশ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করে, 'এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, আমারই ঘটনা। ভেবেছিলাম, বানিয়ে কিছু বলি,

পারলাম না।' আবার চুপ করে থাকল গণেশ। সিগারেট টানল। পরে বলল, 'তোরা তো জানিস, আমি ছেলেবেলা থেকেই মামার বাড়িতে মানুষ। তার অবশ্য কারণও ছিল, আমাদের অবস্থা কোন-দিনই ভাল ছিল না। আমরা অনেকগুলো ভাইবোন ছিলাম; এক ভাই দু' বোন মারা গেছে। এখনো আমরা বেঁচে আছি ন'জন। আমার বাবা এক প্রাইভেট ফার্মে খাতা লেখালেখির কাজ করত। বুঝতেই পারিস, আমাদের সবাইকে মানুষ করা বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার মামার অবস্থা তোরা তো নিজের চোখেই দেখেছিস। আমিও ভেবেছি অনেকসময়, মামাদের এমন অবস্থা থাকতে আমার বাবার সঙ্গে মা-র বিয়ে হলো কি করে! পরে শুনেছিলাম, আমার মা পালিয়ে এসে বাবাকে বিয়ে করেছিল। শুধু তা-ই নয়, আমি নাকি তার আগেই পেটে এসেছিলাম। কী লজ্জা আর অপমানের মধ্যে আমি জন্মেছি বল! মা এবং বাবার ওপর আমার ঘেন্নার শেষ ছিল না; এ বাড়ির সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ আমি এবং আমার দু' বোন মামার বাড়িতে জায়গা পেলাম। প্রথম প্রথম খুব একটা ভাল চোখে আমাদের কেউ দেখেনি, পরে সবাই সয়ে নিয়েছে। মামার ওষুধের বিরাট কারবার।' সিগারেট শেষ হয়ে এসেছে। আরো কটা টান মেরে টুকরোটা ফেলে দিল। বেশ গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল গণেশকে। আবার বলতে শুরু করে, 'আমিও পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে ওই কারবারে লেগে গেলাম। আসলে, মামারও তখন একজন বিশ্বাসী লোকের দরকার। সবসময় দোকানে আসতে পারে না মামা। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই মামাও আমায় সন্দেহ করত। আমিও ততদিনে কায়দাগুলো জেনে নিয়েছি। যেমন ধর, এক নম্বর খাতা, দু' নম্বর খাতা, জাল ওষুধ, বেশী কমিশন কোনগুলোতে, কিভাবে ভেজাল চালাতে হয় ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আর একটা কথা আমার বলা দরকার। অমিত ছাড়া মামার আর কোন ছেলেপুলে ছিল না, তাও নাবালক। আমিও সুযোগ বুঝে কালো টাকার অনেকটাই নিজের

করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু—।' গণেশ এবার বড় করে একটা শ্বাস ফেলল। কি ভাবল ক' মুহূর্ত। বালির ওপর অন্যমনস্কভাবে আঁক কাটল। শেষে মুখ তুলতে তুলতে বলল, 'কিন্তু মামা তা টের পেয়ে গেল একদিন। এজন্য আমায় খুব বকাবকি করল। এমন কি, দোকানে যেতে পর্যন্ত বারণ করল। আমি হাতে-পায়ে ধরেছি, বলেছি : 'অন্যায় হয়ে গেছে, আর হবে না ইত্যাদি কাকুতি-মিনতি যা হয় আর কি! মামা আমার বাবার নাম ধরে অনেক গালিগালাজ করল, তাও আমি হজম করে নিয়েছিলাম। যাই হোক, মামা শেষ পর্যন্ত আমাকে ক্ষমা করেছিল। কিন্তু আমি একদিনের জন্যেও এ অপমান ভুলতে পারিনি। আর তখন থেকেই আমিও একটু আধটু নেশা ধরেছি।' এ পর্যন্ত বলে গণেশ থামল। গ্লাস শূন্য। আবার মদে তা ভরিয়ে নিয়েছে। কথাগুলো ধীরে ধীরে সে বলে গেছে। একবার ওদের মুখের দিকে তাকাল ও। ওরাও কিছু বলছে না। কেমন যেন অবাক, আচ্ছন্ন চোখে ওরা সামনের দিকে চেয়ে আছে। এই ভরা, নেশা নেশা জোছনায় ওদেরও এখন অন্যরকম লাগছে। সমুদ্রের এই একটানা শব্দ যেন ওদের কেমন অচৈতন্য, স্তব্ধ করে রেখেছে। গণেশ চোখ সরিয়ে আনল কি ভেবে। গভীর-ভাবে পরের কথাগুলো সে ভেবে নিল আর একবার। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। পরে আস্তে আস্তে ও বলতে আরম্ভ করল, 'আমার মামাও নেশা করত, নাম-করা খাইয়ে। ছোটখাটো অসুখ-বিসুখ তার প্রায়ই হতো। মামার চেহারাটাও শেষের দিকে ভেঙে পড়েছিল। এমন সময় একদিন বড় রকমের অসুখে পড়ল মামা, মদ খাওয়া একদম বারণ। মামা ছটফট করত। একটু ভাল থাকলেই লুকিয়েটুকিয়ে এনে দেওয়ার জন্যে আমায় কাকুতিমিনতি করত। আমিও এনে দিতাম। আমার লোভ তখন অন্য জায়গায়।' গলাটা কাঁপল গণেশের। কপালে চুলের গোড়ায় বুকের ওপরে গুঁড়ো গুঁড়ো ঘাম জমেছে। চোখ দুটো কেমন ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে। সিগারেট ধরায় আবার। বুকের ভেতরটা ধকধক করছে। সিগারেটের আগুনটা

কাঁপছিল একটু একটু। সামান্য ধোঁয়া গিলতে গিলতে আবার মুখ তুলল গণেশ, বলল, 'আমার মাথায় তখন বদ চিন্তা ঢুকেছে। মামার-বাড়িতে আমাদের কোন সম্মান ছিল না; আমি ঘুমোতে পারিনি ক' রাত্তির; এসব আমায় কি পেয়েছে। মামার সামনে দাঁড়াতে আমার ভয় করত। গলা শুকিয়ে আসত কথা বলতে গিয়ে। আমার মাথা ঘুরত। একদিন, বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি, অন্ধকার। রাত একটু গভীর হয়েছে। আমার মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর পারছি না। কি যেন একটা ভর করেছে আমার ওপর। ভেতরে এক অস্থিরতা, ছটফটানি। পাপপুণ্যের বোধটোধ তখন লোপ পেয়েছে আমার। কাঁপা-কাঁপা হাতে মদের সঙ্গে বেশী মাত্রায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিলাম। মামার সেই ঘুম আর ভাঙল না। আমিও তা জানতাম। এরপর আমায় মাথা ঠাণ্ডা করে একটার পর একটা কাজ করে যেতে হলো। আমার মামীমা কিছুটা টের পেয়েছিল। অমিতকে নিয়ে তাই একদিন নবদ্বীপ চলে গেল। মামার সেখানেও একটা বাড়ি ছিল। পুরো বিজনেসটাই আমার হাতে চলে এলো একদিন। আরো অনেক টাকাকড়ি আমি এরমধ্যে করেছি। আজ ক'দিন ধরে একটা কথা কেবলই আমার মনে হয়েছে, এজন্যেই কি মামাকে আমি খুন করেছিলাম, না আরো কিছু ছিল? আজ কিছু দিন ধরেই মামার মুখটা খালি ভেসে ভেসে উঠছে। কোন কোন মুহূর্তে আমি কথাগুলো বিশ্বাসী কাউকে বলে হালকা হতে চেয়েছি, পারিনি। পারিনি বলতে, ভয় হয়েছে। বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে উঠেছে। আমি অকৃতজ্ঞ, খুনী। আজ এতদিনের সেই বোঝাটা আমি সরাতে পেরেছি, পেরেছি।' সিগারেটের টুকরোটা পড়ে গেল হাত থেকে। গণেশ থামল। এই মুহূর্তে ঢেউগুলো আরো প্রচণ্ড শব্দে যেন ছড়িয়ে গেল। অপলকে সেদিকে চেয়ে থাকল গণেশ। এক-সময় সমুদ্রকে উদ্দেশ করে বিনীত ভঙ্গিতে মনে মনে সে বলেছে: অনেক দিন ধরেই এই পাপ আমি একা একা বয়ে বেড়িয়েছি, আর নয়। তোমার কাছে নতজানু হয়ে আজ আমার এই গোপন অপরাধ

রেখে যাচ্ছি। তোমাকে আমি এই দিলাম। গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দাও, শান্তি দাও। বিমূঢ়, অভিভূত ভঙ্গিতে বসে থাকল গণেশ।

কেউ আর কোন কথা বলল না কিছুক্ষণ। যেন হাতড়ে হাতড়ে মনের অতল থেকে ওরাও কিছু তুলতে চাইছে। ভরা পাত্র কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আবার তা পূর্ণ করে নিল। রাত্রির নিঃসঙ্গতা যেন এখন আরো বেড়েছে। জোছনার রঙ ধবধবে। সমুদ্রও আরো মাতাল, অশান্ত। আরো যেন কি চায়। শব্দের তরঙ্গ বুঝি সমস্ত চরাচরকে গ্রাস করেছে।

কেষ্ট কি একটা ভাবতে ভাবতে গভীরে ডুবে গিয়েছিল। এই পরিবেশ আজ ওদের অনেক দূরে টেনে নিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে ফিরে আসার আর কোন শক্তি নেই ওদের। ওরা যেন আর কোন-কালেও এখান থেকে ফিরতে পারবে না। এ সেই ভয়ঙ্কর পাতাল। লোভের রাস্তাটা খুঁজতে খুঁজতে আজ এখানে এসে পড়েছে। বুকের ভেতরে কী এক ভয় যেন নড়ে উঠল। এখানে যেন কারা ঘোরাফেরা করছে। তাদের অতন্দ্র দৃষ্টি! দূরে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল। বুকটা ধক করে উঠেছে। বুকের ভেতরে কেমন এক কষ্ট হচ্ছে কেষ্টর। মগজের ভেতরও এখন এক ঝিমঝিম ভাব। একটু পরে মুখ তুলল কেষ্ট। গ্লাসে চুমুক দিল। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি, আমিও অনেকদিন ধরে নিদারুণ এক কষ্টকে বয়ে বেড়াচ্ছি, কাউকেই তা বলতে পারিনি। যখনই ওসব কথা মনে হয়, বুকের ভেতরটা আমার জ্বলে যায়। এ কেন করতে গেলাম, আমারই জন্যে আর একজনকে তিল তিল করে মরতে হচ্ছে, আমার চোখের সামনেই; আমি আর এ দৃশ্য এখন দেখতে পারি না। অথচ এ আমি চাইনি, বিশ্বাস কর তোরা, এ আমি কখনই চাইনি।' কেষ্টর গলা ভাঙাভাঙা শোনাল। শেষের কথাগুলো যেন কেমন আর্তনাদের মতন মনে হয়েছে। চোখেমুখে গাঢ় বেদনার ছায়া। চুপ করে থেকে আবেগটা ও সামলে নিল ধীরে ধীরে। আরো কিছু সময় নীরব থাকল। পরে আস্তে

আস্তে আবার বলতে লাগল, 'মাধু আমার বউ। বিয়ের আগে থেকেই আমাদের পরিচয়। মাধু আমাকে ভালবাসল, আমিও মাধুকে। আমাদের বিয়েটা খুব সুখের মধ্যে হয়নি, ওর মা বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়নি, প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল। এমন কি, শুনলে অবাক হবি, গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে একেবারে খতমও করে দিতে চেয়েছিল। অবিশ্যি মাধুর জন্যেই আমি বেঁচে গিয়েছি। আমার জন্যে ও সব ছেড়েছুড়ে এসেছে। ওই সময়টায় আমার ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।' কেষ্ট থামল একটুসময়। একটা সিগারেট ধরাল। সামান্য সময় নিয়ে আবার বলতে শুরু করে, 'আজ পর্যন্তও একদিনের জন্যে মাধু ওর বাপের বাড়ি যায়নি, ওরা নিতে এসেছিল। মাধুকে আমি অনেকসময় বলেছি, আমার জন্যেই তোমাকে সব ছাড়তে হলো, এটা আমার কাছে মস্ত বড় এক দুঃখ ; ওরা যখন নিতে চায়, গেলেই তো পার একদিন।' মাধু কি বলে জানিস ঃ না, এ আর হয় না ; তা ছাড়া সব ছেড়েছি বলেই তো তোমায় পেয়েছি। মাধু হাসে আর হাসে। অথচ আমার বুকের ভেতরটা খচখচ করতে থাকে। কি করে বোঝাই বল, এখানেই যে আমার কষ্টটা আরো বেশী রে! আমি অনেক ছোট হয়ে গেছি ওর কাছে, অনেক ছোট। আমি স্বার্থপর, নোংরা। নিজেরটাই শুধু বড় করে দেখেছি। আমি যে অনেক কিছু সেদিন গোপন করে গিয়েছিলাম ওর কাছে, অথচ পরে তা জেনেছে মাধু। এজন্যে আমার বিরুদ্ধে ওর কোন ঘেন্না বা অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ও যদি আমায় কিছু শোনাত, বলত, তবু খানিকটা শান্তি পেতাম, স্বস্তি বোধ করতাম। আমি তো বুঝতে পারতাম, আমি ওকে ঠকিয়েছি! ওর এই এত বড় ত্যাগের দাম আমি দিতে পারিনি।' কেষ্ট চুপ করল। তার মুখ ম্লান দেখাচ্ছে। সিগারেটটা খেতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না। বিরক্তিতে টুকরোটা ফেলে দিল কেষ্ট। একটু পরে গ্লাসে চুমুক দিল। সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে।

সমুদ্রকে এখন আরো রহস্যময় লাগছে। নরম নরম জোছনায় যেন সব ভিজে গেছে। পা টিপে টিপে কারা যেন ছায়া ছায়া হয়ে

ঘুরে বেড়াচ্ছে এই নিঃসঙ্গ স্তব্ধ দিগন্তহারা চরাচরে। মগজের মধ্যে যেন কারা দ্রিমিদ্রিমি মাদলের তাল তুলেছে। কেষ্ট আরো কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকে। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'আগে যদি কখনো বলতে পারতাম, আজ অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম। অনেকবারই মনে মনে ঠিক করেছি, বলব, আর পারিনি বলতে, ভয় হয়েছে ; যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায়! অথচ শেষ পর্যন্ত ওকে আর রাখতে পারলাম না আমি।' কেষ্ট আবার চুপ। মাথা নীচু করে ও বালির ওপর হিজিবিজি আঁক কাটছিল অস্থিরভাবে। আবার গ্লাসে চুমুক দেয়। অশরীরী কারা যেন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। বুকের ব্যথাটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের চেহারা এই মুহূর্তে আরো ভয়াল দেখাচ্ছে। তাকাতে ভয় করছিল কেষ্টর। বুকের ভেতরে যে কী কষ্ট! না বললে স্বস্তি নেই। আস্তে আস্তে বলল, 'আমার হাতে যে ব্যাণ্ডেজটা দেখছিস, ওটা আমার দু'তিন পুরুষের রোগ। রোগটা আসলে ভীষণ ছোঁয়াচে। আমার বাবা এই রোগে মরেছে। শুনেছি, বাবার জ্যাঠামশাই এবং আমাদের বংশের আরো অনেকেই এতে মারা গেছে।' কেষ্ট এবার মাথা উঁচু করল। সোজাসুজি সমুদ্রের দিকে তাকাল। ভেতরের অস্থিরতা যেন খানিকটা কমেছে এবার। হাত-পাগুলো তার কেমন অবশ-অবশ লাগছে। মনে হচ্ছিল, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো যেন কে খুলে খুলে নিচ্ছে। কোন দ্বিধা না রেখে এবার সে অকপট, অনাড়ষ্ট গলায় বলল, 'আমাদের রক্তের মধ্যে দোষ ছিল। তখন আমি বুঝিনি যে, আমাদের স্পর্শের মধ্যেও এত বিষ। কাছাকাছি এলে কাউকেই তা বাঁচতে দেবে না। মাধুর ভালবাসা আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। ও আমার স্বপ্ন, আমার সব, সব। অথচ ওকেই আমি হত্যা করেছি। আমি জানি, আমার জন্যেই ও মরছে।' থামল কেষ্ট। কি ভেবে নিল, বলল, 'রোগটা কুষ্ঠ, মারাত্মক ধরনের কুষ্ঠ ; ক পুরুষ ধরেই আমরা এর বলি হয়েছি, মাধুর কাছে এটাই আমি গোপন করে গিয়েছিলাম। ওকে আমিই এমন করেছি রে! আজ ওকেও এই রোগে ধরেছে ; ও আর বাঁচবে

না, আমি জানি, বাঁচবে না। ওর দিকে আমি আর এখন চাইতে পারি না, বুক ফেটে যায়। এ দৃশ্য আর দেখা যায় না চোখের সামনে। আমার পাপ ওকে বাঁচতে দিল না। নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি, ছি ছি, এ কি করেছি আমি ; শাস্তি পাইনি। আমার চোখের ওপর একটু একটু করে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ কিছু করতে পারছি না। বারবার মনে হয়েছে, আমিই ওকে হাতে ধরে এমনভাবে মেরেছি। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর তোরা, এমন যে হবে আমি জানতাম না, জানতাম না। এ আমি কি করলাম, কেন করতে গেলাম! আচ্ছা, তোরাই বল না, আমি, আমি ওকে মেরে ফেলিনি, হ্যাঁ আমি ?' কেষ্টর গলা ধরে এল। আর কোন কথা বলতে পারছে না ও। ঢেউ এসে কথাগুলো যেন লুফে নিল। বাতাসে এখন ওর এই চাপা কান্নাই ঘুরতে লাগল। কখনো সমুদ্রের ওপরে, কখনো বা জোছনাভরা নির্জন বালুচরের ওপর দিয়ে ক্রমশ তা মিলিয়ে যাচ্ছে। কেষ্ট অভিভূতের মতন বসে থাকল। আরো গভীরে যেন সে তলিয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের পাতা কেমন ভেজা ভেজা। চোখের কোলে কি যেন চিকচিক করছিল।

মদন ওর শেষের কথাগুলো আর শুনছিল না। এলোমেলো, অস্থিরভাবে সেও তখন কিছু খুঁজছে মনের গভীরে। মনে হচ্ছিল, সমুদ্র যেন আরো কাছে সরে এসেছে। ঢেউগুলো চোখের ওপর ঝিলমিল করছে। একটু শীত শীত করছে। সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে সে হাতের মুঠোয় বালি তুলছে, ফেলছে। হঠাৎ খেয়াল হলো, ওরা সবাই চুপচাপ। সামনে সমুদ্রের ওপর ওদের দৃষ্টি স্থির। বুকের মধ্যে অসহ্য এক যন্ত্রণা হচ্ছে ওর। এবার তার পালা। আরো কিছু সময় নিল। সমুদ্রের জল যেন একটু একটু করে ফুলছে। বাতাসের ঝাপটা এসে মুখে লাগছে। হাঁটু মুড়ে বসেছে মদন। আস্তে আস্তে ও বলল, 'আমার পাপ আরো বেশী, আমি যা করেছি, এ মুখ ফুটে বলা যায় না, নরকেও আমার জায়গা হবে না রে। আমি পাপী, ঘোর পাপী।' বলতে বলতে চুপ করে গেল মদন। মনে মনে কি ভাবল যেন।

আবার শুরু করল, 'তোদের মনে আছে, মাঝপথেই পড়াশুনো ছেড়েছুড়ে দিয়ে একদিন বাড়ি থেকে আমি উধাও হয়েছিলাম! সেদিন এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না আমার সামনে। বাবার ওপর আমার ভীষণ রাগ হলো। বুড়ো বয়সে বাবার এ কি ভীমরতি! আমার মা, লক্ষ্মীর জন্মের সময়ই মারা গেছে, সেও অনেক বছর হয়ে গেল। আমার বাবা এর ক'মাসের মধ্যেই আবার বিয়ের জন্যে মেতে উঠেছে। একরত্তি মেয়েটাকে কে দেখবে! ওর জন্যেই যেন বাবা এরকম একটা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। আসলে, লক্ষ্মী একটা সামান্য ছুতো মাত্র। আমি বাধা দিলাম। বলেছি: ঘরে বড় বড় ছেলেমেয়ে থাকতে আপনি এ আবার কি করতে যাচ্ছেন? বাবা আমার ওপর ভীষণ রেগে গেল। রেগে যাওয়ারই কথা। বাবা আমাকে মারতে এল। তোরা বিশ্বাস কর, ওই সময়ে আমার মাথার ঠিক ছিল না, ঠিক রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি বাবাকে জাপটে ধরেছিলাম। যা বলা উচিত নয়, তাই বলেছি। তবু বাবা শোনেনি। আবার বিয়ে করে বসল। যে আমাদের ঘরে এল, আমি তাকে দেখে চমকে উঠলাম। ওর বয়েস আমারই সমান, ছোটও হতে পারে। দেখতে সত্যই সুন্দরী। ওর জন্যে আমার কষ্ট হলো। এর পর বাবা আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করল। আরো যেন কি রকম সন্দেহ করত। বাড়িটা আমার কাছে দিন দিনই অসহ্য হয়ে উঠল। আর পারলাম না। ওদের সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে চলে গেলাম। আমি থাকলে অশান্তি আরো বাড়ত তখন।' থামল মদন। সমুদ্রকে একদৃষ্টে দেখল খানিকক্ষণ। কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে এই মুহূর্তে। আরো কিছু সময় চুপ করে থেকে কি ভাবল। আবার দৃষ্টি প্রসারিত করতে করতে ও বলল, 'ক বছর পর আবার ফিরে এলাম আমি। বাবা মারা গেছে ততদিনে। বাবার এই দ্বিতীয় পক্ষকে আমার কেন জানি কখনো মা বলতে ইচ্ছে হয়নি। বলিও নি আমি। আমি তখন পুরোপুরি যুবক। এই প্রথম ভাল করে ওর রূপ দেখলাম আমি। বুকের

ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। বাবার ওপর আমার ঘেন্না আরো বেড়ে গেল। এমন একটা মেয়েকে আমার বাবা মেরে গেছে, জল্লাদ। আর ওর মা-বাবাই বা কেমন, টাকার লোভে মেয়ের এত বড় সর্বনাশটা করল! আমি বুঝতে পারতাম, আমি ফিরে আসায় ও খুশি হয়েছে। মুখে আবার সেই হাসি ফিরেছে। প্রথম থেকেই একটা ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছে, ওর চলায় ফেরায়, কথাবার্তায় আমার বাবার জন্যে কোন দুঃখ ছিল না। ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ বাড়তে থাকে। আমার ওপর যেন টানটা সবচেয়ে বেশী। চোখের ভাষায় অন্য কোন ইঙ্গিত ফুটে থাকত। আমিও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিলাম। মনে মনে ভয় পেলাম। ওর চোখে তো অন্য ভাষা! আমি ভেবেছি, হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে। কিন্তু মেলাতে পারছি না কিছু। একদিন সুযোগ বুঝে চা দিতে এসে ও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। চোখে-মুখে রহস্যের ভাব। ওর সমস্ত চেহারায় আগুনের আঁচ। আমাকে ও যেন পুড়িয়ে ফেলবে। আমি তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম। ও আমার আরো কাছে সরে এল। পরে সোজাসুজি বলল : এভাবে জীবনভর এই কষ্ট আমি কেন সইব বলতে পার! দীর্ঘশ্বাসে যেন আরো কিছু বলতে চায়। আমার হাতটা কাঁপছিল। গলাটা কেমন আঠা আঠা লাগছিল। পরমুহূর্তেই ও খিলখিল করে হেসে উঠেছে। আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলেছে, 'আমি বাঘ-ভালুক নই, ভয় নেই ভীতুরাম।' ও চলে গেলেও আমার অস্বস্তি কমল না, আরো বাড়ল সেটা। আমি চোখে চোখে তাকাতে লজ্জা পেতাম তখন। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করতে থাকত। এরকম লুকোচুরি চলল বেশ কিছুদিন। আমিও তখন এক নেশায় জড়িয়ে পড়ছি। কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসি। খুব একটা বেরোই না ঘর থেকে। বাইরের আড্ডা কমে গেছে। আমার সামনে ওর কোন সঙ্কোচ ছিল না। তোদের বললেই বুঝতে পারবি। যেমন ধর, শরীর থেকে শাড়ি পড়ে গেছে, আমার চোখের সামনে ওর দেহের অনেকখানি খোলা, ওর সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

এটা ও ইচ্ছে করেই করত। অথচ এ সময় অন্য কেউ ঘরে এলে ও ঠিকঠাক হয়ে বসত। আমার সামনেই সায়া ব্লাউজ ছেড়েছে বহু দিন। রাত্তিরে মশারি টাঙাতে এসে অনেকক্ষণ ধরে ও এটা ওটা গল্প করে সময় কাটাত। আমার শরীর খারাপ হলে, সুইচ অফ্ করে দিয়ে আমার মাথা-টাথা টিপে-টুপে দিত। ওর শরীরের তাপ বাড়ত। আমি তা বুঝতে পারতাম। ওর অনেকখানি শরীর যে তখন আমাকে ছুঁয়ে থাকত! কোন কোন দিন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বাড়ি পাড়া সব নিঝ্ঝুম হয়ে আসত, তারপরও ও আমার এখানে থাকত। আমার অবস্থাটা তোরা বোঝ। ছোট ভাইবোনগুলোও যেন আমাকে অন্যরকম চোখে দেখতে শুরু করছে। আজ স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই আমার, এই উঠতি, দামাল বয়েসে বাবার দেওয়া সম্পর্কটা আমরা কেউই মানতে পারছিলাম না।' আবার চুপ। কপালে ওর রেণু রেণু ঘাম। কেমন যেন অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। হাতটা কাঁপছে সামান্য। একটু পরে ফের ও বলল, 'আমরা তখন ধীরে ধীরে এক পাতালে তলিয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক ভেবেছি। আর পারছিলাম না। কিছু ভাবলেই মাথা টনটন করে, চোখ জ্বালা করে।' আবার ইতস্তত করল মদন। সঙ্কোচভাবটা কাটিয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে। পরে ঋজু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, এক বর্ষার দিনে আমরা দৈহিক সম্পর্কে এলাম। এভাবে আরো ক' মাস কেটেছে। এর মধ্যে তখন আর এক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমি আবার এক নতুন ভাবনায় জড়িয়ে পড়লাম। আমার ঘুম হতো না। শুকিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি যেন একটা পশু হয়ে গিয়েছি। যেটুকু মানমর্যাদা তখনো আছে, সেটুকুও বুঝি গেল। আমি চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারতাম না। শেষে তীর্থে যাওয়ার নাম করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। অনেক জায়গা ঘুরলাম।' এক সময় মদনের গলা আড়ষ্ট হয়ে এল। চোখ দুটো এই মুহূর্তে কেমন ঘোলা। মগজে কি যেন একটা পাক খাচ্ছে। বিড়বিড় করে বলল, 'শেষে আমাদের এই পাপ ঢাকবার জন্যে বাবার দ্বিতীয় পক্ষ আত্মহত্যা করল। আচ্ছা, তোরাই বল

তো, এই পাপ কি সত্যি সত্যিই ঢাকা পড়েছে আমার?' মদন পলকহীন চোখে চেয়ে থাকল সমুদ্রের দিকে।

এবার রীতিমত শীত করছিল ওদের। বাতাসে কিসের গোঙানির শব্দ। সমুদ্রের জল যেন ফুলছে, কেবলই ফুলছে। মনে হলো, ঢেউ-গুলো এগিয়ে আসছে। ওদের কেমন ভয় হলো। জোছনার গাঢ় নেশায় সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন, বেহুঁশ। হঠাৎ গণেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'উঠে পড়, জোয়ার শুরু হয়েছে, জল বাড়ছে।'

এক সময় ওরা উঠে পড়েছে। পুবের আকাশে তখন টকটকে লাল আলোর ছিটছিট দাগ। কাল সারা রাত ধরে সগর রাজার ছেলেরা ছায়া ছায়া হয়ে ওদের সঙ্গে ছিল। কী ভয়ই না করেছে। এখন ওসব কোন ভয় নেই। দূরে এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কারা যেন স্নানে নেমেছে। বাতাসে, ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং···সূর্যস্তব ভেসে ভেসে আসছে। ওরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। বাতাসের বেগ যেন বাড়ছে, আরো বাড়ছে। পুব আকাশ আরো লাল হয়ে উঠেছে। গাঙচিল উড়ছে, সমুদ্রের জলে নেমে খেলায় মেতেছে। পাখিরা কিচিরমিচির শব্দের ভেতরে ডুবে আছে। সব যেন আবার কেমন স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়ে উঠছে। সকালের এই আলোয় ওরা কেমন সঙ্কোচ, লজ্জা বোধ করছিল। কেউ কারো মুখের দিকে এখন যেন তাকাতে পারছে না। শেষবারের মতন পেছনের দিকে ফিরে তাকাল ওরা। দেখল, সমুদ্র এতক্ষণে ওদের গত রাতের গ্লাস, বোতল, পড়ে থাকা যাবতীয় জিনিসপত্তর সব কিছুই নিয়ে নিয়েছে। নিঃশব্দে মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকে। ওরা আবার নিজেদের সংসারে ফিরে চলেছে। যেতে যেতে এখানকার কিংবদন্তীটা আবার ওদের মনে পড়ল। ওটা তা হলে মিথ্যে ছিল না!

ভাঁটার টানে

বিড়ির টুকরোটা ফেলে দিয়ে নিবারণ আরো একবার আকাশের দিকে তাকাল। কিছু পুঞ্জিত, ধূসর মেঘ যেন রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কিছুসময় সেখানে চোখ রেখে কি যেন খুঁজল সে।

'মনে অইতাছে ম্যাগ্‌ডা এইবার কাটল।' ধীরে ধীরে নিবারণ চোখ সরিয়ে আনে।

'কাইলও ত এইরকম মনে অইছিল কয়বার।' পঞ্চানন নিবারণের দিকে চাইতে চাইতে বলল।

আজ এই সামান্যক্ষণ আগে বৃষ্টিটা ধরেছে। গতকাল সকাল থেকে জল নেমেছিল। কখনও জোরে, আবার কোন সময় শীর্ণ, দুর্বল রেখায়। একটু সময়ের জন্যেও থামেনি। দু'একবার শুধু মেঘের ঢাকনা সরিয়ে রোদের রেখা বেরিয়ে আসতে চেয়েছে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই কালো ভারী মেঘগুলি আবার তাকে ধরে নিয়ে গেছে। নিবারণ এখন দেখল, পুবদিকের একটা জায়গা সামান্য ফরসা হয়েছে। ধোওয়া মোছার পরে জায়গাটাকে কেমন পবিত্র, ঝকঝকে মনে হচ্ছিল তার। উড়ন্ত, টুকরো মেঘের ভেতর দিয়ে আকাশের কিছু নীল, অনাবৃত অংশ চোখে পড়ছে। কিছুক্ষণ আগেও ভারী, জলভরা মেঘ আকাশের বুকে জমেছিল। এখন মেঘের ঢাকনাটা সরিয়ে দিতে দিতে আলোর কণাগুলি ধীরে ধীরে প্রাঙ্গনে নেমে এসেছে।

'পঞ্চাদা?'

'কি রে?'

'ঐ দ্যাহ, অতক্ষণে রইদ্‌ উঠছে।' নিবারণকে উৎফুল্ল, হৃষ্ট মনে হচ্ছিল। 'আরে বাপুস, কি রকম পুবাইল বাতাস বইতে শুরু করছে দ্যাখ্‌ছ?'

'হুঁ, তা ত দ্যাখছি। অহন বাড়ি যা ত তুই, ভিজা জামা কাপড়ডা গিয়া ছাড় আগে। সারারাইত ত জলে ভিজ্‌ছ্‌।'

'আরে অত সহালে বাড়ি যামু কি গো, কি যে কও তুমি। তাছাড়া আমার কিছু অইব না ছাইখ্য।' একটা নিশ্বাস নিল টেনে টেনে।

পঞ্চানন উঠে গিয়ে একটা শুকনো কাপড় নিয়ে এসেছে। নিবারণ আপত্তি করল না পরতে।

পঞ্চাননের বাড়ির বাইরের ছোট একটা ঘরে বসে ওরা কথা বলছিল। বড় রাস্তার পাড়েই পঞ্চাননের ডেরা। দুখানা মাত্র ঘর। দরমার বেড়া দেওয়া। মাথায় টালি। অনেকগুলো টালি ফেটে গেছে। বৃষ্টি হলেই এখন ঘরের মধ্যে ছোট ছোট ফোঁটায় জল পড়ে। পঞ্চাননের বাড়ি থেকেই বস্তিটার শুরু। নিবারণের ঘরটা আরো ভেতরে।

'কাইল এক ফুডাও ঘুম অয় নাই।' পঞ্চানন পুরনো চাদরটা গায়ে আরো জড়িয়ে নিতে নিতে তাকাল নিবারণের দিকে।

'ক্যান, টালিগুলি আইজও বদলাও নাই?'

'ভাবছিলাম ত বদলামু, তা আর অইল কই!'

'এইবেলা না সারাইলে ত বর্ষায় কষ্ট পাইবা।'

পঞ্চানন কিছু বলল না।

রাস্তার ওপর এখন হাঁটু পরিমাণ জল। ওপাশে ড্রেন। ড্রেন পেরোলেই পার্ক শুরু। কৃষ্ণচূড়া, দুটো রাধাচূড়া এবং বেড়া দেওয়া ছোট ছোট কটা কুঞ্জ পেছনে রেখে ক পা এগোলেই একটা বড় পুকুর। বর্ষার জল পুকুর ডুবিয়ে ফেঁপে উঠেছে। এ বছরে এ রকম বৃষ্টি এই প্রথম। রাস্তায়, ড্রেনের এখানে-ওখানে বস্তির কিছু কুচো ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে। পরম উৎসাহে ওরা ভেসে যাওয়া মাছের পেছনে নিজেদেরও ভাসিয়েছে। পার্কের মাঠে, পুকুরের কিনারে বড়দের ভিড়। এখন ভিড়টা কম। নিবারণও কাল সারারাত ওদের দলে ছিল। এই বর্ষা কখন যেন ওদের ঘর থেকে এখানে টেনে এনেছিল।

'পঞ্চাদা, ঐ ছাহ, পুলাপানগুলো একটা তিতপুঁটি লইয়াই কি খুশি!'

'এইডাই অগো কাছে অনেক। অরা কি আর আমাগোর মতন

নদী নালায় মানুষ অইছে! আরে, আমরাও ত আছিলাম জলের কীরা।'

'যা কইছ! তাই জল ছ্যাখলেই মনডা খালি টাডায়। ঠিক থাকতে পারি না।' একটা নিশ্বাস ছাড়ল নিবারণ।

'নারে নিরা, আমার অহন সব সইয়া গ্যাছে।' পঞ্চাননের গলাটা কেমন ভারী, বিষণ্ণ শোনাল।

বড় গাছগুলোর ডালে বসে ভেজা ক্লান্ত কাকেরা রোদের তাপ খাচ্ছে। চক্রাকারে চিল উড়ছে। দু' একটা বকও এসেছে ওখানে।

'তুই একটু বয় নিরা, আইতাছি আমি, যাইছ না কিন্তু।'

'একটা বিড়ি দিয়া যাও ত পঞ্চাদা।'

পঞ্চানন চলে গেলে নিবারণ বিড়ি ধরাল।

গতকাল সন্ধ্যের আগেই কাজ থেকে ফিরেছিল নিবারণ। জলের অনুক্ষণ শব্দ যেন তখন ওর মনের চারধারে একটা নেশার চাক বাঁধছিল। বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি করে দুটো মুখ দিয়ে গায়ে সামান্য সরষের তেল মাখল। গামছাটা কোমরে জড়িয়ে নিল। 'ইস্ কি ধুলা জমছে ছ্যাখছ', নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে একটা অপরিষ্কার, আবর্জনার কুলুঙ্গি থেকে বাহারে জালটা তুলে আনে। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে একসময় মাথায় হাত দিয়ে ও বসে পড়ল।

'সর্বনাশ অইছে!' অসহিষ্ণু বিরক্ত ক্ষোভের গলায় নিজেকে শুনিয়েই ও বলতে থাকে, 'এই রকম কইরা ফ্যালাইয়া রাখলে নষ্ট অইব না ত কি। ইঃ, কি আউসের জিনিসটা এইভাবে নষ্ট অইতাছে রে, কেউ ছ্যাহে না! বুঝছি, আমার সবই এই রকম কইরা শেষ অইব।'

চম্পা আর তুলসী সেই মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা বাপের এরকম আচরণের কারণ কি ঠিক বুঝতে পারছিল না। নিরুত্তর, শঙ্কিত ভঙ্গিতে শুধু দাঁড়িয়ে থাকল।

'হাঁ কইরা কি ছ্যাহছ, সুইচ আর সুতাডা আইন্যা দে।'

সুঁচ আর সুতো নিয়ে এল তুলসী। নিবারণ জাল মেরামত করতে বসল। ইঁদুরে অনেকগুলো জায়গা কেটে দিয়েছে।

'তর মার কি আর এই সংসারের উপর মায়াদয়া আছে।' একটা ফাঁস ঠিক করে অন্য একটা ফাঁসে সুতো গলাতে গলাতে তুলসীর মুখের দিকে চাইল নিবারণ। 'পিরাণের পকেট থাইক্যা একটা বিড়ি আন্ ত তুলসী, ম্যাচ বাতিডাও আনিছ।'

চম্পা নিবারণের কাছাকাছি বসেছে। তুলসী বিড়ি আনতে গেলে নিবারণ চম্পাকে কয়েকবার লক্ষ্য করল। কিছু সময় নীরব থেকে কাজ করতে করতেই কোমল, মমতাভরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তর মা কহন গ্যাছে রে?'

'আইজ একটু দেরি কইরা গ্যাছে।' চম্পা আরো কাছে সরে আসে। জালকাঠিগুলো হাতে নিয়ে ও নাড়াচাড়া করল কিছুসময়। তারপর বাপের চোখের ওপর নরম, শান্ত দৃষ্টি রাখল, বলল, 'অনেক মাছ আনবা।'

'আনুমনে।'

'জান বাবা—!' চম্পা এখন নিবারণের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

'কিরে—?' নিবারণ ওর মুখের ওপর স্নিগ্ধ, স্নেহময় দৃষ্টি রাখল।

'আইজ না পিলুর বাবা অনেক মাছ ধরছে।'

নিবারণের দৃষ্টি এবার সামান্য কৃত্রিম রূঢ়তায় ভরে উঠেছে। 'আবার বুঝি রাস্তায় গেছিলি?'

'কিছুতেই আনন্ যায় না অরে, মাছ ধরা দেখব।' তুলসী বিড়ি হাতে নিবারণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিবারণ বিড়ি ধরিয়ে চম্পার দিকে চেয়ে খানিকটা শক্ত গলায় বলল, 'আরঅ যাবি?'

চম্পা চোখ নামিয়ে নিয়েছে অনেকক্ষণ। ভেতরে ভেতরে কান্না জমছিল ওর। ঠোঁট দুটো থরথর করছে। এবার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'না।'

'এই ছাহ, এইতেই কান্দন, আমি কি তরে বকছি?' নিবারণ আদর করে চম্পাকে কাছে টেনে নিল। 'ঠিক আছে, আর যাইছ না; জানছ্ না, হেইদিন লোকটা বাছের তলায় পইড়া কেমন মইরা গ্যাল।' চম্পার চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে বলল নিবারণ। আদরের স্পর্শ মেয়ের মনের ভেজা ভাবটা মুছে নিয়েছে মুহূর্তে। তারপর তুলসীর দিকে চেয়ে বলল, 'তর মারও ত শরীল ভাল না, গ্যাল ক্যান্ আইজ?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিবারণ। জালটা ঝেড়ে ঝুড়ে ঠিক করে ঘরের বাইরে এল। ছোট বারান্দা ধরে ক পা এগিয়ে যায় সে। 'আরে, পলডা ছাহি এগ্‌বারেই গ্যাছে।' বলতে বলতে অনেক রকমের জঞ্জালের ভেতর থেকে পলটা বের করে আনল। মানুষের সাড়া পেয়ে কটা ইঁদুর ছুটে গেল পাশ দিয়ে। নিবারণের মনে হলো, এই ইঁদুরগুলোই ওর সংসারের অনেক শখের জিনিস নষ্ট করে দিয়েছে। অনেক যত্নে, অনেক গোপনে, সে একদা এক উর্বর ভূখণ্ড থেকে একটি ঈপ্সিত বস্তুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। বস্তিতে দীর্ঘদিন ধুলো আবর্জনার স্তূপের মধ্যে থেকে তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কখন যে নিঃসাড় হতে শুরু করেছিল, নিবারণ তা জানতে পারেনি। বুকের তলায় এতক্ষণ একটু একটু করে যে করুণ, ভারী বাতাস জমছিল, এখন তাকে বাইরে এনে দীর্ঘ সময় ধরে ছড়িয়ে দিল। আর একটা ইঁদুর তার সামনে এসে পড়েছে তখন। নিবারণ সাধ্যমত শক্তি সংহত করে ওটাকে মারতে গেল। পারল না। না পারার ব্যর্থতায় তুলসীর দিকে সোজা চোখ রেখে ও বলল, 'তর মা-রে আইজ বারণ করছিলি যাইতে?'

'কইছিলাম, হুন্‌ল না।'

'তা হুনব ক্যান্।' গলায় ক্রোধ এবং বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ছিল।

দু'দিন আগেও জ্বরে ভুগেছে লক্ষ্মী। কিছুদিন ধরে প্রায়ই থেমে থেমে জ্বর হচ্ছে। আগের চেয়ে ও এখন অনেক রোগা, দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবই বোঝে নিবারণ। তবু না বোঝার মতন করে সে সংসারে আসে যায়। মাঝে মাঝে শুধু বুকের পাঁজরার মধ্যে একটা বেদনা

অনুভব করে। কি করবে সে! সঙ্গে যে সামান্য সঞ্চয় এনেছিল, তাই দিয়ে সে একটা বাতাসার দোকান খুলেছিল। বাতাসার কাজটাই তার জানা। বেশ দু' পয়সা আসছিল। চম্পা এর দু' বছর পর লক্ষ্মীর পেটে এসেছে। আর সে বছরই তার রোগটা প্রথম প্রকাশ পেল। প্রথমে বুকে ব্যথা। ডাক্তার দেখাল লক্ষ্মীর কথায়। বুকে জল জমেছে। ভেঙে পড়ল নিবারণ। মাথায় আজেবাজে সব চিন্তা। এই ঢিলেঢালা, অনিয়মের অবসরেই দোকানটা একদিন অন্যের হাতে চলে গেল। বিরাট এক অন্ধকারকে তার সামনে জমাট হয়ে থাকতে দেখল। ভয় পেয়েছে নিবারণ। লক্ষ্মী তখন তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল, 'ভাইব না, একভাবে চইল্যাই যাইব, অত ভাবলে শরীলডা যে আরও খারাপ অইব।'

এর কিছুদিন পর কেমন যেন নিরুদ্বেগ মন নিয়ে একদিন লক্ষ্মী নিবারণের কাছে এসে দাঁড়াল। হাসি মুখ করে শুধলো, 'আইজ ক্যামন্ লাগে?'

'আগের মতনই—।' নিবারণ চিন্তিত, ক্লিষ্ট চোখে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চায়।

'ডাক্তারবাবু ত কইছে ভাল অইয়া যাইবা।'

'হঁ হঁ, ডাক্তার ত কইবই, মুহের কথায় কি আর চিড়া ভিজে!' কাতর, বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল নিবারণকে।

লক্ষ্মী ক পা এগিয়ে এসে ওর গা ছুঁয়ে দাঁড়াল।

'যাও ছিল, মাইল্যা রোগে ত সব নিল।' নিবারণ ক্ষোভের গলায় বলল।

'রোগ অইলে কি করণ্।' লক্ষ্মী দু' পলক নিবারণকে লক্ষ্য করে। একটা নিশ্বাস ছাড়ে ধীরে ধীরে। কি একটা কথা বলার জন্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছিল যেন সে।

'জান, আমি একটা কাজ পাইছি।' লক্ষ্মী ধীরে ধীরে বলল।

নিবারণ মুহূর্তে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকায়। কিছু সময় অপলক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ও কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিল না, লক্ষ্মী আবার কি কাজের কথা বলছে। অস্ফুটে শুধু বলল, 'কা-জ ?'

'হঁ গো, কাজ পাইছি। কি, বিশ্বাস অইতাছে না ?' লক্ষ্মীর ঠোঁটে স্বধু পাতলা হাসি। তারপর অন্যদিকে চাইতে চাইতে বলল, 'কাইল পটলের মা আইছিল, অরা রান্নার একজন মানুষ চায়, মাসে পঁচিশ ট্যাহা দিব, খাওয়া পরাও অরা দিব কইছে। আমি রাজী অইয়া গেলাম।' লক্ষ্মীর দৃষ্টি কেমন উদাস, বেদনাতুর হয়ে উঠল।

নিবারণ দৃষ্টি আনত করেছে। কোন কথা বলতে পারল না ক দণ্ড। আরো দুর্বল শক্তিহীন নেশাগ্রস্ত লোকের মতন মনে হচ্ছিল তার নিজেকে। মনে হচ্ছিল, অমোঘ বিধানের মতন তাকে কথাগুলো শুনিয়ে গেছে একজন। তারপর একসময় সে একান্ত দুঃখী, নিরুপায় মানুষের মতন অনুচ্চ স্বরে ধীরে ধীরে বলল, 'এমনডা যে আমি কুনদিন ভাবি নাই লক্ষ্মী।'

'এই জলে ভিজতে তুমারে বারণ কইরা গ্যাছে মা।' তুলসী বাপের অন্যমনস্ক, মগ্নভাব ভাঙবার জন্যে একটু জোরেই বলল কথাটা।

কথাটা নিবারণ শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। পর মুহূর্তে কি মনে করে ঘুরে তুলসীকে লক্ষ্য করে বলল, 'খাওয়া-দাওয়া সাইরা শুইয়া পড়িছ্ তরা।' বলতে বলতে বৃষ্টির অন্ধকারে নেমে পড়ল নিবারণ।

'এই নে, চা খা নিরা।' পঞ্চানন দু' গ্লাস চা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা নিবারণের দিকে এগিয়ে দিল।

'খামাকা আবার চা করতা গ্যালা ক্যান্?' গ্লাসটা হাতে নিল নিবারণ।

'ঠাণ্ডাডা কি রকম দ্যাখ্ছ্।' চায়ে চুমুক দিল পঞ্চানন।

'হঁ, তা একটু পড়ছে।' নিবারণ জলের ওপর দিয়ে শব্দ করে করে কিছু লোককে চলে যেতে দেখল। একটুক্ষণ সেদিকে চেয়ে পঞ্চাননের দিকে চোখ ফেরাল, 'যাই কও পঞ্চাদা, এই জলের কিন্তু সাংঘাতিক একটা নেশা আছে।'

কিছু না বলে নীরবে চা শেষ করল পঞ্চানন। গ্লাসটা রাখতে রাখতে সে নিবারণের মুখের দিকে তাকাল ক দণ্ড। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কয়দিন আগে তুলসীর মা আইছিল, কি হাল অইছে চেহারার, দ্যাইখ্যা চিনাই যায় না। সময় থাকতে একটা ভাল ডাক্তার দ্যাহাইছ্ নিরা।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা বিড়ি ধরাল। নিবারণও কোন কথা বলছে না।

'আর একটা কথা কই তরে, মাছ মারার নেশাডা এইবার ছাইড়া দে, যা মইরা গ্যাছে, তারে আর জীয়াইবি কি কইরা, ক। বউ মাইয়া-গুলারোদিগে না চাইয়া ছিপের পিছনে ট্যাহা ঢালনের কি ঠ্যাহা?

'আমি কি আর তা বুঝি না পঞ্চাদা, কিন্তু কি করুম, সামলাইতে পারি না।' নিজের এই অক্ষমতার জন্যে যেন এখন দুঃখ হচ্ছিল নিবারণের।

নিবারণ বুঝতে পেরেছে, পঞ্চানন কেন তাকে একথা আজ বলল। কিন্তু সেদিন এমনটা হতো না। লক্ষ্মীর আশ্বাসেই সকাল থেকে ছিপ ঠিক করতে বসেছিল নিবারণ। কেননা, আগের দিন রাতে অনেকক্ষণ জেগে লক্ষ্মীর ভরসাতেই মাছ ধরার চার তৈরী করেছে। সুগন্ধ সরঞ্জাম সন্তর্পণে কৌটোয় বন্ধ করে রেখেছিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই নতুন উৎসাহে আর একবার কৌটো খুলে গন্ধ নিল। গন্ধ পেয়ে কিছু কাক এসে উঁকি দিয়েছে সেই মুহূর্তে। ছিপগুলি ঠিক করে এক পাশে রেখে দিল।

লক্ষ্মী ততক্ষণে ভোরের আলস্য নিয়ে উঠোনে পা দিয়েছে। এমনি সকাল সকাল ও বেরিয়ে যায় প্রায় রোজ। নিবারণ বউকে দেখল কয়েক পলক। আগের রাত্রে ওর কাছে কটা টাকা চেয়ে রেখেছিল সে। কোন কথা না বলে লক্ষ্মী চলে যাচ্ছিল। নিবারণ তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কি গো, তুমি যে যাইতাছ।'

'হুঁ, আমার কাছে আর নাই।' লক্ষ্মীকে ক্ষুব্ধ, রুক্ষ মনে হচ্ছিল।

'কাইল যে কইলা দিবা।'

'আমার কি মনে আছিল যে আইজ র‍্যাশন তুলতে অইব!'

'এক জায়গায় আইজ যাওনের কথা!' নিবারণকে ক্ষুণ্ণ এবং আহত দেখাছিল।

'না গ্যালেই ত অয়, যাইতেই অইব অ্যামন কি কথা! তাছাড়া আইজ পর্যন্ত ত কম ঢাললা না ছিপের পিছন।' গলায় বিরক্তি এবং অসন্তোষ ছিল। আর অপেক্ষা করল না লক্ষ্মী।

খুশি খুশি মন নিয়ে সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিল নিবারণ। শুরু না হতেই দিনটা যে তার কাছে এমনভাবে বিষণ্ণতায় ভরে উঠবে, তা কে জানত। একটা চোরা ক্রোধ সেই দণ্ডে তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভেতরে ভেতরে এক প্রচণ্ড শক্তি সংগ্রহ করছিল নিবারণ। না গেলে যেন তার পৌরুষে ঘা লাগবে। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ও বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যের দিকে পা দিয়েই নিবারণ টের পেল, বাড়িটা বড় চুপচাপ। ঘরে তখনও আলো জ্বলেনি।

'তুলসী কইরে?'

'এই যে।' অন্ধকার ঘর থেকে জবাব দিল তুলসী।

মেয়েকে এভাবে ঘরে বসে থাকতে দেখে নিবারণ কিছুটা অবাক হলো, বলল, 'অন্ধকারে বইয়া কি করছ, সন্ধ্যা অইল, অহনও কুপিডা ধরাছ নাই?' নিবারণ ঘরের দিকে এগিয়ে আসে।

'না ধরায় নাই, আমি অরে ধরাইতে ছ্যাই নাই।' ঘরের ভেতর থেকে লক্ষ্মী বেরিয়ে এসেছে বারান্দায়।

মুহূর্তে নিবারণের মুখটা পাণ্ডুর, বিবর্ণ হয়ে এল। এ সময় লক্ষ্মী ঘরে থাকবে ও তা ভাবেনি। নিজেকে পরক্ষণেই সামলে নিয়েছে। ছিপটা এক পাশে রাখতে রাখতে নরম গলায় শুধলো, 'আইজ যাও নাই?'

'অইছে, আর পীরিতের কাম নাই, অনেক ছ্যাহাইছ।' ক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লক্ষ্মী এবার সোজা তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এই অস্পষ্ট, মরা মরা আলোতেও লক্ষ্মীকে কেমন রুষ্ট, শক্ত মনে হলো নিবারণের।

'নিজের বউরে অন্যের বাড়ি খাডাইয়া ফুডানি করতে শরম লাগে না তুমার ? কুন্ আক্কেলে অর কাছ থাইক্যা র‍্যাশন তুলার ট্যাহাডা নিলা, তুমি না বাপ ?'

'কইলাম ত কাইলই দিয়া দিমু।' শান্ত আত্মসমর্পণের গলায় বলে নিবারণ।

'ছ্যাও চাই না ছ্যাও, আমি আর দিতে পারুম না কইয়া থুইলাম। নিজের শরীলডা যে মাইল্যার সংসারের জন্য শেষ কইরা দিতাছি, সেইডা ত একবার কেউ ছ্যাহে না।' শেষের কথাগুলো ক্রমশ কান্নায় কোমল হয়ে এসেছে। লক্ষ্মী দ্রুত পায়ে ঘরে চলে গেল।

নিবারণের এখন মনে হলো, ঘটনাটা পঞ্চানন জেনেছে। হয়তো লক্ষ্মীই তাকে বলেছে। টাকাটা এখনও সে দিতে পারেনি। লক্ষ্মীর জন্যে এক গভীর মমতা ও ভালবাসা অনুভব করল সে।

নিবারণের গায়ে পুবের উদাসীন হাওয়া এসে লাগছিল এই মুহূর্তে। হাওয়াটা ঘন ঘন দিক পরিবর্তন করছে।

'পঞ্চাদা ?'

'হুঁ ?'

'ছ্যাশের কথা মনে পড়ে তুমার ?'

'পড়ে না আবার !' এক করুণ শূন্য আতুর দৃষ্টি পঞ্চানন সযত্নে সামনের গাছগুলোর ওপর ধীরে ধীরে বিছিয়ে দিল।

'এই বাতাসটা ভাল ঠ্যাকতাছে না।'

'বড় আউলাইন্যা বাতাস !' পঞ্চানন অন্যমনস্কের মতন বলল।

'বইন্যার বাতাসের মতন।'

আকাশটা অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘন কালো রঙে আবার মাখামাখি হয়ে গেছে। পুকুরের জলে ঢেউ উঠছে। গাছের পাতারা এলো-মেলো মাথা নাড়ছে। কটা কাক উড়ছিল দূরে। ঘাস এবং কচি পাতাগুলোকে এখন বিষণ্ণ, মলিন দেখাচ্ছিল। একটা ধ্বনি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। দামাল বাতাস মাতলামি করছিল। ভেজা মাটি ও ঘাসের

যুগপৎ একটা গন্ধ বাতাসে উড়ছিল তখন। জলের একটা শব্দ উঠছে। সেই সঙ্গে কিছু খুচরো মানুষের ভিড়।

'কি রকম মাছটাছ পড়ছে রে নিরা, নাহি খালি খালি অত কষ্ট করতাছে লুক্‌গুলান ?' পঞ্চানন নিবারণের দিকে তাকাল।

'না,—বেশী আর কই!' বলতে বলতে নিবারণ মাছের ডোলাটা থেকে অল্প কটা টেংরা পুঁটি বের করল, 'এই কডা রাইখ্যা দাও পঞ্চাদা।'

'অত ছ্যাইছ নারে, গুড়া মাছ কুটার লুক নাই আমার।'

নিবারণ হেসে ফেলল। বলল, 'পঞ্চাদা, অ্যাইহানে আইয়া সি সব ভুইল্যা গেলা, ছ্যাশে এই কয়ডা মাছ কি কেউ দিত, না এই মাছ মাইন্‌সেরে ছ্যাওয়ার মতন ?'

'তুই কি অর থাইক্যাও বিলাবি নাহি ?'

'না—, মাছ কই যে বিলামু, মন চাইলেও ত পারুম না। তবে সুবইল্যার মা-রে কয়ডা মলা, আর ক্যাষ্টদার বাড়িতে মাগুরডা দিমু। জান, অনেক কষ্ট অইছে ধরতে, ডাক্তার নাহি জীয়ল মাছের ঝুল খাইতে কইছে অরে।'

'তুই ছ্যাহি তর বাপের স্বভাবডা কাইড়া লইছছ্‌।'

নিবারণ কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে চোখ ফেরাল, 'না পঞ্চাদা, বাপের স্বভাব কইথনে পামু, এর লাগিল আলাদা ভাইগ্য লইয়া জন্মাইতে অয়।' নিবারণ থেমে থেমে অন্যমনস্ক গলায় কথাগুলো বলল।

'মদন জ্যাডারেও ছ্যাখতাম, শাউন মাসটা আইতে না আইতেই নৌকো লইয়া চইল্যা যাইত হাউরে, পরের দিন, কি তারও পরে, ডোলা ডোলা মাছ নিয়া ফিরত। সব বাড়িতেই বিলাইতে বিলাইতে যাইত। সে এক দিন গ্যাছে, বুঝলি নিরা ?' পঞ্চানন যেন একটু একটু করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এক বিস্মৃত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিচ্ছিল।

নিবারণকে এখন অন্যমনস্ক, করুণ দেখাচ্ছে। তারও মনে পড়ে সে-সব দিন কোন কোন মুহূর্তে। যেদিন ঢল নামত, সমস্ত আকাশ মেঘেরভারে সুপারি, জলপাই, আমলকী, করুই আর মান্দার গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাটিতে মাঠে প্রান্তরে এবং গো-পাটের সীমানা ছুঁয়ে

নেমে আসত, সেদিন নিবারণ দেখত, ওর বাপ যেন আর এক মানুষ। কোন কোন দিন আস্তে আস্তে তাকে শুধতো, 'যাবি নাহি আইজ ?'

নিবারণ মাথা নাড়ত আনন্দে। তারপর সেই ফুলন্ত জলে নৌকো চড়া, হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বিলের বুকে অন্ধকার রাত্রিতে মাছ ধরা, তার মনেও নেশা ধরাত। ওর বাপ জিজ্ঞেস করত, 'ডরাছ নাহিরে নিরা ?'

ও মাথা নাড়ত। মনে ভয় থাকলেও মুখে বলত, 'উঁহু।'

'এই ত পুরুষের মতন কথা, তবে নয়া নয়া ডর একটু লাগব, পরে ছ্যাহিছ্ সব ঠিক অইয়া গ্যাছে।'

আরো কিছু বাতিকে সেই ভুতুড়ে অন্ধকারে জলের ওপর ঘোরাফেরা করতে দেখত নিবারণ। মাঝে মাঝে হাঁক ছেড়ে তার বাবা কিসব বলত অন্যদের সঙ্গে। জবাব দিত তাদের বিচিত্র প্রশ্নের। নিবারণ সব বুঝত না। জলের একটানা উঠানামা শব্দ, দুরন্ত অবুঝ হাওয়া, তার মনে অপরিসীম উদ্দাম এক আনন্দ ও বিস্ময় সঞ্চার করত। কোন কোন দিন ওরা বিল পেছনে রেখে নদীর বুকেও চলে গেছে। সেই ঘোলাটে অন্ধকারেও নিবারণের বাবা টের পেত, ওরা নদীতে পড়েছে। জলের শব্দ সেখানে কিছুটা অস্বাভাবিক, গম্ভীর। প্রথম প্রথম ওর বুকটা ঢিপ ঢিপ করত। তারপর কখন যেন একদিন বুঝতে শিখেছিল বিলের একটা শেষ আছে ; আর সেটা ক্ষুদ্র, অপরিসর। আর যেখান থেকে নদীর শুরু, সেখান থেকেই জলের বিস্তার।

যেদিন নৌকো বিলের সীমানা ডিঙ্গিয়ে নদীতে পড়ত, ওর বাবা বলত, 'সাবধানে বইছ নিরা, নৌকা কিন্তু অহন আসল গাঙে পড়ছে। বেশী লড়াচড়া করিছ না।' তারপর নিবারণকে লক্ষ্য করে শুরু করত, 'এইহান থাইক্যা গাঙের শুরু বুঝছছ্ ত ?' অন্ধকারেই জলের ঘ্রাণ নিতে নিতে গুরুর মতন শেখাবার ঢংয়ে বলে যেত ওর বাবা, 'এইহানে ঢেউটা অত বেশী ক্যান ক ত ?' নিবারণ চুপ করে থাকত। শুধু টের পেত, নৌকোটা এখানে অতিরিক্ত রকম দুলছে।

'কি, পারলি না ত ? পারবি, আস্তে আস্তে সব পারবি।' বলে ওর বাবা বিড়ি ধরাত। তারপর বিড়ি টানতে টানতে থেমে থেমে বলত,

'এইহানে একটা নতুন চরা পড়তাছে, তিন চাইর্ হাত তলাতেই মাটি, বুঝলি ত?' নিবারণ বোকা বোকা চোখে তাকাত ওর বাবার দিকে। 'জল কম, তাই অত দ্যামাক তুমার। হঁ হঁ আমরা সব বুঝি, আমাগোর উপর গোঁসা কইরা এইবার অন্যদিকে যাইবা ঠিক করছ!' নিবারণ লক্ষ্য করত ওর বাপ যেন নদীর সঙ্গে কথা বলছে।

'কি কইতাছ বাবা?' গলুইয়ের কাছে বসে নিবারণ বাপকে এই মগ্ন আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনত কোন কোন দিন।

'এই নদী বড় অভিমানী, বুঝলি নিরা? আমাগোর সঙ্গে গোঁসা কইরা খালি পলাইতে চায়। বাপ ঠাকুরদার আমল থাইক্যা ছ্যাখতাছি, কতবার যে পলাইতে চাইছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে নাই, তবে অহন বুঝি ছাড়ব!' বলতে বলতে থেমে যেত একসময় নিবারণের বাবা। এ সময়টা বড় খারাপ লাগত তার কাছে। নিবারণ সব না বুঝলেও একটা কথা তার মনে হয়েছে, ওর বাবার কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত এক নেশা আছে। আবেগে থর থর করত কথা-গুলো। অনেকক্ষণ পর ওর বাবা একসময় বলত, 'অতক্ষণে নৌকা আসল গাঙে পড়ল, ছ্যাখ ঢেউডা এইহানে কত কম।' নিবারণ শুধু টের পেত, নৌকোটা একটা দোল খেয়ে তখন অন্য একটা টানায় পড়েছে।

এখন আরো মনে পড়ছে নিবারণের, ওর বাবা প্রায়ই একটা কথা বলত, 'ছ্যাখ নিরা, একটা কথা তরে শিখাইয়া ছ্যাই, যহনই মনে অইব মনডা খারাপ, তহন এইরকম সব জায়গায় চইল্যা আইছ্, আর কিছুর লাগিল না, মনডা বড় সাফ অইয়া যায়। মনে রাহিছ, এই যে তরে কইলাম কথাডা, এইডা কিন্তু একদিনে শিহি নাই।'

এই মুহূর্তে নিবারণের মনে গভীর এক দুঃখ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল।

'খুব জুর একটা ম্যাগ আইতাছে।' নিবারণকে চুপ এবং অন্যমনস্ক দেখে পঞ্চানন বলল কথাটা।

'হুঁ।' নিবারণ তখনও অন্য কথা ভাবছে। মনে হচ্ছিল, ওর বাবা তাকে সঞ্চিত বিদ্যার পুরোটা দিয়ে যেতে পারেনি। এখানে আসার

আগে নদীর বুকেই থেকে গেল মানুষটা। এখানে আসবে বলেই হয়তো এমনটা হয়েছে। একদিন সন্ধ্যের মুখে ওর বাবাকে দেখে নিবারণ চমকে গিয়েছিল। ওর বাবার ওরকম উদভ্রান্ত চেহারা ও একবারই দেখেছে জীবনে। কেমন বিড় বিড় করার গলায় ওকে বলেছিল, 'সাবধানে থাহিছ্, কাইল মৌলভী পাড়ায় সভা অইয়া গ্যাছে, ফুটকা মিঞা একটু সাবধানে থাকতে কইছে। দুইখ্যার লাসটারে ত কাইল চরায় আটকাইতে দেইখ্যা আইছি।' এর দু'দিন বাদেই যখন সমস্ত গ্রামের হৃদপিণ্ডটা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল, তখনও নিবারণরা ওর বাপের জন্যে অপেক্ষা করেছে। এসব কথা ভেবে নিবারণের চোখের কোণে জল জমল। ধীরে ধীরে সজল চোখে সে পঞ্চাননের দিকে তাকাল। ক'মুহূর্ত নীরব থেকে বেদনার্ত সুরে বলল, 'ভালই অইছে, আইলেও বাঁচত না।'

'তুই কি অহনও এই সব ভাবতাছছ্?'

'না—, মনে করাইয়া দিলা তাই—।' কেমন ব্যথিত করুণ শোনাল গলার স্বর। 'আমি অহন উডি পঞ্চাদা, শরীলডাও ভাল লাগতাছে না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নিবারণ।

ঠাণ্ডা বাতাস লাগছিল গায়। অনেকক্ষণ জলে ভিজেছে। শরীরটা বেজুত লাগছে। কপালের শিরা দুটো দপ দপ করছে। উঠোনে পা দিয়েই নিবারণ ডাক দিল, 'তুলসী উঠছছ্ নাহি রে?'

ভেতর থেকে তুলসী জবাব দিল, 'হুঁ।'

'মাছের ডোলাডা ধর।' বলে ক'পা এগিয়ে গিয়ে জায়গা মতন পল ও জালটা রাখল।

তুলসী বেরিয়ে এসেছে। বাপের হাত থেকে মাছের পাত্রটা নিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। পরে কেমন যেন ঈষৎ ক্ষুণ্ণ, নিরুৎসাহ গলায় বলে ফেলল, 'মুডে এই কয়ডা?'

তারে টাঙানো গামছাটা টেনে নিতে নিতে দুপলক তুলসীকে দেখল নিবারণ। পরে ঘরের লাগোয়া বারোয়ারি কলতলার দিকে যেতে যেতে কিছুটা আহত গলায় বলল, 'বেশী আনলে ত তরই কষ্ট, বুঝছ না,

কুচা মাছ কুটতে কুটতে মাজায় টান ধরত।' মুহূর্তের জন্যে যেন সযত্নে লালিত একটি গভীর কষ্টকে বের করে দিল।

'মা-রে একটা খবর দিলেই অইব!'

'দিলেই কি আইব!' বলে গায়ে জল ঢালতে শুরু করল নিবারণ।

স্নান সেরে কাপড়টা দড়িতে মিলে দিতে দিতে নিবারণ তুলসীর দিকে চাইল। দু' দণ্ড নীরব থেকে ধীরে ধীরে শুধলো, 'আইজ তর মা-র শরীল ক্যামন রে?'

'জ্বর নিয়াও ত গ্যাছে।'

'হুঁ।' আর কিছু না বলে নিবারণ ঘরে এল। দেখল, চম্পা তখনও ঘুমোচ্ছে। কাপড় পরতে পরতে কি যেন ভাবল সামান্য। তারপর বাইরে এসে তুলসীকে বলল, 'কি রানবি এইগুলান দিয়া?'

'তুমিই কওনা কি রাতুম।'

'তর যা মনে লয়।' তুলসীর চোখে চোখে চেয়ে আবার বলল, 'এই গুড়া মাছ দিয়া তর মা কিন্তু ঝাল বড় ভাল রান্দে!'

তুলসীও সেই মুহূর্তে নিবারণের চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আনে। ধীরে ধীরে নীচু গলায় বলল, 'মা-রে তা অইলে একটা খবর দ্যাই।'

নিবারণ কি ভেবে উঠে পড়ে সেখান থেকে। ঘরে এসে চম্পাকে তুলে দিয়ে সেই বাসি বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'আইজ কামে যাইবা না বাবা?'

তুলসী ঘরে এল। বাপকে এরকম অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল।

'নারে, শরীলডা জুইত লাগতাছে না। বড় শীত শীত করতাছে।' বলতে বলতে পাশ থেকে একটা কাঁথা টেনে নিল নিবারণ।

তুলসী আর কোন কথা বলল না।

আরো পরে দুপুরের দিকে ঘরে এসে তুলসী দেখল, ওর বাবা তখনও শীতে কুঁড়িমুড়ি করছে। কাছে গিয়ে ডাক দিল, 'খাইতে আস বাবা।'

সামান্যক্ষণ আগে নিবারণের ঘুম ভেঙেছে। তবু চোখ বুজে পড়ে ছিল। তুলসীর ডাকে জ্বালা জ্বালা চোখে তার দিকে চাইল।

'আর একটা কাঁথা দে।' নিবারণের দৃষ্টি ততক্ষণে যন্ত্রণায় আরো কুঁকড়ে এসেছে।

'তুমি খাবা না?' তুলসী কাঁথা এনে ওর বাবার কাছে রাখল।

'না—, তরা খাইয়া ফ্যাল।' কাঁথাটা গায়ে টেনে নিতে নিতে আর একবার মেয়েকে দেখবার চেষ্টা করল। 'খাড়াইয়া রইলি ক্যান, কইতাছি ত খামু না।' বলে চোখ বন্ধ করল নিবারণ।

কি ভেবে তুলসী ওর বাবার পাশে বসল। কপালে হাত দিয়ে সামান্য উষ্ণতা অনুভব করে জিজ্ঞেস করল, 'রুটি কইরা দিমু?'

'কইলাম ত খাইতে মন লইতাছে না!' একটুক্ষণ চুপ থেকে ফের বলল, 'যদি পারছ, খাওয়া দাওয়া সাইরা তর মা-রে আর একবার খবর দ্যাইছ।'

তুলসী চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পর আবার চোখ মেলল নিবারণ। কাঁচা ঘুম ভাঙার জ্বালাটা এখন অনেকটা সয়ে এসেছে। বার দুয়েক আস্তে করে চোখ দুটোকে রগড়ে নিল। তারপর সোজা উঠোনের ওপর চোখ রেখে নিবারণ বুঝল, তখনও বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প। বুকের কাছের পুরনো ব্যথাটা আবার বেড়েছে তার। কেমন টনটন করছে। তুলসী কখন যেন খোলা জানালাটা টেনে দিয়ে গেছে! ঘরে সামান্য অন্ধকার ঝিমঝিম করছিল। ঘরটাকে এখন তার কাছে খুব ঠাণ্ডা, নির্জীব বলে বোধ হচ্ছে। রোদের তাজা, টাটকা আলো এসে এ-ঘরে কোনদিন পড়েছে বলে তার মনে পড়ে না। দেয়ালের ওপাশে আবর্জনা ফেলার জায়গা। একটা দুর্গন্ধ সবসময় আশেপাশে বাতাসে উড়ছে। পুবমুখো জানালাটা বরাবরের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে। এই ঘর, পরিবেশ এখন বড় নোংরা, দূষিত মনে হচ্ছিল নিবারণের। বড় ক্লান্ত, অসহায় লাগছিল নিজেকে। বিছানাপত্তরও বাসি, ময়লা। বহুদিনের জমানো একটা রুগ্ন অস্বাস্থ্য গন্ধ ঘরময় ছড়ান। লক্ষ্মী যেন এখন এ সংসারের আর কেউ নয়। এগুলোও ত পরিষ্কার করতে পারে!

নিবারণ কোনদিন ভাবতে পারেনি, লক্ষ্মীকে এরকম একটা কাজ করতে হবে। সেজন্যে ওর মনেও একটা ক্ষোভ আছে। একদিন সেও বলতে পারে, 'লক্ষ্মী, কাজডা ছাইড়া দ্যাও।' কিন্তু কোনদিনও তো বলতে পারল না তা। এজন্যে কোন কোন মুহূর্তে নিজেকে অক্ষম পঙ্গু বলে মনে হয়েছে তার। আর এই বোধটা এখন তাকে বেশী পীড়ন করছে। অমাবস্যা বা একাদশীর ভরণে সমস্ত শরীরে যেমন একটা চাপাচাপা টনটন ব্যথা দেহময় ছড়িয়ে পড়ে, নিবারণের মনেও কষ্টটা একটু একটু করে এখন আরো ঘন, ভারী হয়ে বুঝি তার সত্তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। অসহায়ের মতন একটা শব্দ করে সে পাশ ফিরল। তুলসী চম্পাকে নিয়ে ততক্ষণ ওর মাকে খবর দিতে গেছে।

কিছুক্ষণ পর তুলসী ফিরে এল। নিবারণ তখনও জাগা। তুলসীকে সে দেখল।

'মা অহন্ আইতে পারব না।' মনে হচ্ছিল, তুলসী ওর মা-র কাছ থেকে অখুশি বিরক্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছে।

হঠাৎ নিবারণের দৃষ্টিটা উদাস, বিষণ্ণ হয়ে উঠল। মনের ভেতরে একটা অভিমান, দুঃখ এই দণ্ডে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তুলসীর দিকে তাকাতে এখন তার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। এই সংসারে তার যে একটা স্থান আছে এবং সেটা সম্মানের ও গৌরবের তা যেন এই মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়ো করে দিল লক্ষ্মী। এখন আরো স্পষ্টভাবে বুঝল, এই সংসারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা শিথিল, দুর্বল। কখন যে এর ক্ষয় শুরু হয়েছিল, নিবারণ তা বলতে পারবে না। তবে সেটাকেই প্রত্যক্ষ করে এখন সে গভীর কষ্ট বোধ করল। তাকে যেন আরো কাতর দুঃখিত দেখাচ্ছিল। কাঁথাটা গায়ে টেনে নিয়ে স্বাভাবিক বলার চেষ্টা করল, 'ঘরে থাহিছ্ তরা।' বলে চোখ বুঝল নিবারণ। ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। বুকের ব্যাথাটা আবার টন টন করছে। তার নিজের কথা আর কোনদিনও সংসারের কারো কাছে বলবে না। মনে মনে সে তিন সত্য করল। এমনটা করতে গিয়ে তার দুঃখ আরও গভীর হলো। ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। চোখ

ছুটো ভারী হয়ে উঠেছে। কাঁথাটা এবার মাথা পর্যন্ত টেনে নিল। তারপর একটা হাত দিয়ে চোখের কোণা বেয়ে যে জল গড়িয়ে পড়ল, তা মুছে নিল আস্তে আস্তে। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিবারণের, দেশে থাকতে একবার তার অসুখ করেছিল। এমন কিছু মারাত্মক নয়। তবু লক্ষ্মীর কী কান্না! সেই স্পর্শ আর একবার মনে মনে সে অনুভব করতে চাইল। এসব কথা মনে পড়ায় অনেকক্ষণ ধরে তার স্পর্শসুখ আস্বাদন করতে গিয়েও মনে হলো, এর সঙ্গে অনুক্ষণ একটা যন্ত্রণা মিশে রয়েছে। একসময় ক্লান্তিতে, অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ল নিবারণ।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। নিবারণ জেগে উঠে দেখল, ঘরের এক কোণায় একটা ভাঙা হ্যারিকেন জ্বলছে। চিমনিটার শরীরে কালো সীস। আলোটাও কেমন ঘোলাটে। চম্পা একপাশে ঘুমোচ্ছে। তুলসী বারান্দায়। এমন সময় লক্ষ্মীর গলা শুনল নিবারণ। তুলসীকে বলছিল লক্ষ্মী, 'তর বাপরে গিয়া এইবার ডাক দে, আর কত ঘুমাইব, খাইতে টাইতে ত অইব, রাইত ত কম অয় নাই।'

তুলসী ঘরে এলে নিবারণ বলল, 'মুড়ি আছে?'

'শরীলে জ্বর, মুড়ি কি, সাবু! করছে তুলসী, তাই খাও।' লক্ষ্মী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল। গলার স্বরটা সামান্য রুক্ষ, মমতাশূন্য মনে হলো।

তুলসী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। নিবারণ কিছুটা তেতো গলায় বলল, 'খাড়াইয়া রইছছ্ যে, কথা কি কানে ঢুকে নাই, চাইর্ আনার মুড়ি আনতে কইলাম যে।'

তুলসী পয়সা নিয়ে মুড়ি আনতে গেল।

'ও চলে গেলে লক্ষ্মী কি ভেবে নিবারণের কাছে এল। গায়ে হাত রাখল। তারপর ক্ষোভ এবং ঈষৎ অভিমান মেশানো গলায় বলল, 'কাইল সারারাইত কে ভিজতে কইছিল! ঘরে একটা অশান্তি সবসময় জ্বালাইয়া না রাখলে শান্তি পাও না, না?'

নিবারণ হ্যারিকেনের ভেতরে মুমূর্ষু আলোটা দেখতে দেখতে সামান্য রূঢ় স্বরে বলল, 'আমার লাগিল কাউরে অশান্তি ভুগাতে অইব না।'

'তা অইলে ত বাঁচা যাইত।' লক্ষ্মী বিছানা পাততে পাততে কথার জবাব দিল। নিজের মনেই একসময় ক্ষোভে দুঃখে বিরক্তিতে বলতে থাকে, 'মাইল্যার ভগবানও চোখ উল্টাইয়া রইছে, কবে যে নিব, আর পারি না অত অশান্তি সইতে।' চোখে জল এসে গিয়েছিল লক্ষ্মীর। চম্পাকে এক হাতে জোরে টান দিল, 'এই উঠ্, তরা আমারে সব কয়ডা জ্বালাইয়া খাইছছ্, আর কত জ্বালাবি।' চম্পা কেঁদে উঠল। লক্ষ্মী আবার ধমকের সুরে বলল, 'কান্দছছ্ যদি খুন কইরালামু।' বিছানা ঝেড়েঝুড়ে একহাতে টেনে এনে চম্পাকে আবার শুইয়ে দিল।

তুলসী মুড়ি নিয়ে এসেছে।

মুড়ি খেতে খেতে নিবারণ তুলসীর কথা শুনল। 'তুমি খাইবা না মা?'

'নারে, আমি খাইয়া আইছি।'

'এই বাড়ির খাওন ত তুমি ছাইড়াই দিলা।' একটু থেমে তুলসী ক্লিষ্ট স্বরে বলল।

মুড়িগুলোও এখন বিস্বাদ লাগছিল নিবারণের। বাটিটা একপাশে ঠেলে দিল।

নিবারণ তখনও জেগে ছিল। অনেক রাত হয়েছে। চারদিক স্তব্ধ। ঘর অন্ধকার। তুলসী চম্পা ওরা ঘুমুচ্ছে। ও টের পাচ্ছিল লক্ষ্মী তখনও ঘুমোয়নি। নিবারণ ভাবছিল সময়ে মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। এই অন্ধকার, নিস্তব্ধ জলো পরিবেশে তারও মনে এক গভীর দীর্ঘ অদ্ভুত ভালবাসা বিস্তৃত হচ্ছিল। এই মুহূর্তে সে গাঢ় এক মমতা ও আবেগ অনুভব করে বউয়ের জন্যে। লক্ষ্মীকে কোনদিনও সুখ দিতে পারল না, এটা তার কাছে দুঃখের, বেদনার। অথচ কত কষ্টে

যে লক্ষ্মী সংসারটা কাঁধে নিয়ে চলেছে! নিবারণ একটা নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে। অস্বস্তিতে পাশ ফিরল। লক্ষ্মীর গায় আস্তে আস্তে সে একটা তপ্ত হাত রাখল।

লক্ষ্মীরও ঘুম আসছিল না। তারও মনে এক প্রগাঢ় অভিমান ফুলে ফুলে উঠছে। মানুষটা যদি কোনদিনও সংসারের কথা ভেবে দেখল! আবার অসুখ বাঁধিয়েছে! কেন, তাকে না জ্বালালে কি আর শান্তি নেই! লক্ষ্মীর চোখে জল এসে গিয়েছে। গভীর রুদ্ধ এক আবেগকে সে ঠোঁট কামড়ে কামড়ে সামলে নিচ্ছিল।

নিবারণ আরো কাছে সরে এল। লক্ষ্মী আর নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না। নিবারণের হাতটা সে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল পরম আদরে। এবং পাশ ফিরে ওর বুকের কাছে সরে এসে ক্লান্ত, সর্বহৃত মানুষের মতন অসহায়, অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলল, 'আমি আর পারিতাছি না গো, পারতাছি না।'

নিবারণের বুকেও তখন উথাল-পাথাল।

তাপ

বোশেখের গোড়াতেই খরাটা পড়েছে। খরা তো নয়, যেন কঞ্চির মতন কতগুলো লিকলিকে সাপ হিসহিস শব্দ তুলে চারদিকে ক্রমাগত ছুটোছুটি করছে। ওদের উষ্ণ নিশ্বাসে এরই মধ্যে বুঝি সব জ্বলে-পুড়ে যাবে। জীবন সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে। এই সাতসকালেই দিনের যা তেজ! কেমন এক ক্লান্ত, ঢিলেঢালা দৃষ্টিতে এবার সে সামনের দিকে তাকাল।

সুরেন হাতির দোকানের সামনে দুটো কুকুরবাচ্ছা ঝিম মেরে শুয়ে আছে। রোদটা আবার ওদের গায়ে এসে পড়েছে এই মাত্তর। গনগনে রোদ্দুর সইতে না পেরে ওরা ক্রমশ সরে সরে শীতল ছায়া বেছে নিচ্ছিল। সেদিকে চেয়ে জীবন ম্লানভাবে সামান্য হাসল। হাত পাঁচেক দূরে রোদটা তখন ওদেরও চেয়ে চেয়ে দেখছে। অতি সন্তর্পণে গুটিগুটি এগিয়ে আসছিল। আর একটুর মধ্যেই ধরে ফেলবে বুঝি।

ওরা কজন তেঁতুল গাছটার তলায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছিল। তখনও ওদের মধ্যে কেউ কেউ মুড়ি খাচ্ছে। গল্প করছে। এই কিছুক্ষণ আগে জীবন মুড়ি খাওয়া শেষ করেছে। এখন আরাম করে একটা বিড়ি টানছিল। এখনও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা নরম ভাব আছে এখানে। অথচ সামনের চিক চিক করা রোদের দিকে তাকালে, এখনই যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন। কেবলই তেষ্টা পায় এ-দিনে।

জীবন আবার চোখ তুলল। সুরেন হাতির দোকানের বাঁ দিকে খানিকটা জায়গা, একটু জঙ্গলের মতন। কটা বাবলা গাছ সেখানে। বাঁশবরণ পাতা দিয়ে জায়গাটা ঘের দেওয়া। পাতাগুলোর গায়ে ধুলো কাদার দাগ। তাই কেমন মলিন দেখাচ্ছে। একটা না দুটো মান্দার গাছও আছে। কিছু আশশেওড়া; আর তার সঙ্গে কটা বুনো লতার ছোট মতন ঝোপ। এই জঙ্গলের পাশেই আরো কটা দোকান।

তবে অধিকাংশই চা-এর। এখান থেকে চা-এর গ্লাসে চামচ নাড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল জীবন। এত সকালেই যে এভাবে দিনের সমস্ত উদ্যম-কলকলানি ঝিমিয়ে পড়বে, তা ভাবতে পারেনি সে। লোকগুলো তাড়াতাড়ি করে নৌকায় গিয়ে উঠেছে। এখানে বসে বসেই জীবন সব লক্ষ্য করছিল।

বাতাসটা পড়ে গেছে। তাই গরমের মাত্রাটা ক্রমশই বাড়ছে। থেকে থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধানে তিরতির করে কিছু পাতা কাঁপছিল শুধু। এখান থেকে জীবন এখন দেখতে পাচ্ছে, কটা শালিক উড়তে উড়তে এসে এই মাত্তর বাবলার ডালে পা রাখল। শব্দ করল। খুঁটে খুঁটে কি যেন খেল। পরস্পর পরস্পরকে আদর করল। তারপর লাফাতে লাফাতে ওরা এখন, ওই জঙ্গলের আড়ালে চলেই গেছে।

এখানে অনেকক্ষণ ধরে সে অল্প অল্প করে গাছ-গাছালির একটা গন্ধ পাচ্ছিল। ঘ্রাণটা যেন সর্বত্র ছড়ানো। জীবন জোরে জোরে কয়েকবার গন্ধটা নাকে টানল। এখন তা শুকিয়ে ক্রমশই ক্ষীণ হালকা হয়ে আসছে।

কটা কাক অনেকক্ষণ ধরে মাথার ওপর ডালে বসে ডাকছে। জীবন ছোট মতন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দিল। কাক কটা চিৎকার করে আরও একটু দূরে গিয়ে বসল।

জীবন দৃষ্টিটাকে এবার নদীর দিকে প্রসারিত করে ওদের নৌকোটাও দেখল। দুটোর পরেই হারাধনদের নৌকো। এখনও লোক উঠছে সেখানে। আর কতগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আরো কিছু দূরে একটা জায়গায় কটা জেলেনৌকো। জেলেরা এখানে থাকে না। মাঝে মাঝে আসে। ওরা নৌকো কিনারে রেখে বিরাট বিরাট জাল মেলে দিয়েছে রোদে। দু-তিনটে ছোটো ছেলে নৌকো ধুয়ে পরিষ্কার করছে। কিছু কুকুরও জড়ো হয়েছে ওখানটায়।

মাছের গন্ধ পেয়ে অনেক গাংচিল নেমে এসেছে ডাঙ্গায়। কিছু মাথার ওপর চক্কর মারছে। আর কতগুলো জলের ওপর পড়ে

ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খেতে খেতে কিনারে চলে আসে, আবার উড়ে গিয়ে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর খুশিতে সাঁতার কাটে। ওরা যেন আজ কোন এক ভোজবাড়িতে এসে জড়ো হয়েছে। আশেপাশে কিছু কাকও ছিল।

আবার যেন তেষ্টা পাচ্ছে তার। জীবন মনে মনে হিসেব করল, আজ মাসের কত। কিন্তু বারবারই কোথায় যেন তার একটা ভুল হচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছিল, আজ মঙ্গলবার। কিন্তু হিসেবের গিঁটটা কিছুতেই ছাড়াতে পারছিল না। বুকের তলায় আর একবার কিসের যেন একটা শব্দ শুনতে পায় জীবন। ঠিক এমন সময়ই হারাধন মাঝি তার এখানে এসে বসল। জীবন তাকে হারাধনদা বলে ডাকে। এক সময় ওর বাবার নৌকোতে হারাধন কাজ করত। এখন সে অন্য নৌকোর মাঝি হয়েছে। বয়েস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ।

হারাধনের দিকে চোখ তুলল জীবন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করল, 'হঁ-গো দাদা, আইজ মাসের কত কউ ত?'

'কেনরে, আইজ ত মাসের ছ।'

'আগের মঙ্গলবার ত চৈত্ সংক্রান্ত মেলা যাইচে, তাউ নয়?'

'হঁ।'

'আর আইজ এক মঙ্গলবার, মঙ্গলে মঙ্গলে আট, তার থাকতে এক বাদ দিলে হয় সাত। কিন্তু গগনদা কইথল আইজ ছ, তুমিও কওঠছ।' জীবনের গলার স্বরে তখনও একটা সংশয় স্পষ্ট।

'ঠিকই ত কইঠি, তর যে গোড়াতেই ভুল রে।' হারাধন ওর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু করে হাসতে থাকল।

জীবন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কোথায় তার ভুলটা। মনে মনে আরো একবার সে হিসেব করল। চুপ করে থাকল কিছু সময়। কিন্তু না, আবার ভুল হচ্ছে হিসেবে। হবে না তাকে দিয়ে। মাথাটা আরো গরম হয়। বিরক্ত বাড়ে। জীবন বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে তাই হারাধনের মুখের ওপর চোখ রাখল। বলল, 'কি রকম?'

'কি রকম কি, আইজ ত সমবার।'

'সমবার ?' জীবন আরও অবাক হওয়ার চোখ নিয়ে হারাধনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'হঁ হঁ সমবার।' হারাধনও একদৃষ্টে জীবনকে দেখেছিল।

'তাউ কউ, মাথাটা একবারে খারাপ হইচে।' জীবনের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে আসছিল ক্রমে। এতক্ষণে ভুলটার কারণ বের করতে পেরে ঈষৎ খুশি হয়েছে যেন সে।

একটা কাক জোড় পায়ে লাফিয়ে মুড়ি নিয়ে পালাচ্ছিল। আরও কটা তার দেখাদেখি মাটিতে নেমে এসেছে। হারাধান দু-মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। পরে জীবনের দিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, 'তর আর দোষ কি, যে জ্বরে পরথুলু একদিনে সেটা ত কাহিল করাইয়া দেয়।'

জীবন ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

'আর দু'দিন ঘরে রইলে ত পারতু।' হারাধন টেনে টেনে বলে।

'না না, ঘরে থাইলে খাবু কি! আর তুমি ত জান গো দাদা, ঘরে থাইলে যেন দম আটকি যায়।' দু'মুহূর্ত নীরব থাকে জীবন। একটা ঢোঁক গিলে গাছের দিকে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে আবার বলল, 'পিঞ্জরায়, পাখি দেখচ ত, অর মতন খালি ছটফট করে।' কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে জীবন।

'তা, আমানে হইলি ত জলের পোকা, ঘরে রইতে কি আর মন লাগে।' জীবনের ঘরে না থাকার কৈফিয়তটা হারাধনের যেন মনের মতন হয়েছে। তাই প্রসন্ন মনে মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। তারপর জীবনের চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'দে গেটে বিড়ি দে।'

জীবন দুটো বিড়ি বের করে একটা হারাধনের দিকে এগিয়ে দিল। অন্যটা নিজে ধরাল।

ভাঁটা হয়ে গেছে। আর এক সিকি জল কমলেই হারাধন তার নৌকো ছাড়বে। যাবে মরাগলিয়া। হারাধন বিড়িটায় একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'আইজ কতদিন দু (থেকে) কেমন কাঁঠাল পাকা গরম পড়চে দেখচু ত?' ধীরে ধীরে বিড়িটা

টানতে থাকে ও। 'আরও একটা দিন তুই ঘরে রইলে পারতু, তর শরীরটা বড় পাঁউসা হইচে।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর হারাধন আস্তে আস্তে বলল।

জীবন বিড়িটা এক সময় ফেলে দিল। কেমন এক ঘোলাটে তেঁতো স্বাদ লাগছে জিভে। হারাধনের মুখের দিকে সে স্থির শান্ত পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ক দণ্ড। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ওকথা আর কইবু নি।' কেমন যেন এখন অন্যমনস্ক পীড়িত দেখাচ্ছে তাকে।

হারাধনও জীবনের মুখের দিকে চেয়ে ক মুহূর্ত কি ভাবে। কিছুটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে কি খুঁজল যেন। তারপর সামান্য হেসে বলল, 'জীবন একটা কথা কইবু, ক রাগ করবু নি?'

'তুমার কথায় কবি রাগ করচি, কইতে পার?' বলতে বলতে মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল তুলে নেয় জীবন। হাতে নিয়ে সেটা নাড়াচাড়া করে।

'এবার ঘরে একজনকে লিয়ায়, তর বুড় মা ত আর পারেনি। সেদিন না কীর্তিবাসের কাচে গেলি, সেঠি তর মা বুসইয়া থাইল। আমাকে দেখ্ইয়া কান্তে লাগল বুড়ী,' হারাধন চুপ করে। জীবনকে ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকে। এরই মধ্যে জীবন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। চোখে-মুখে তা ক্রমশ ফুটে উঠছে। বিড়িটা টান দিতে গিয়ে হারাধন টের পেল, কখন যেন সেটা নিবে গেছে। পোড়া বিড়িটায় আর একবার আগুন ধরিয়ে নিয়ে জোরে জোরে কটা টান দিল। পরে একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফের বলল, 'তাউ কই, কি এক এবার একটা বে থা কর জীবন।' এতক্ষণ যেন ভেবে নিচ্ছিল হারাধন কি ভাবে বলবে কথাটা। গলার স্বরে তাই একটু নরম ভাবছিল।

হাতের ডালটা ফেলে দিয়ে জীবন হাসল। তেঁতুলের কটা শুকনো পাতা কাঁপতে কাঁপতে এসে মাথায় পড়ল। জীবনের এ হাসির তলায় কোথায় যেন সামান্য একটু বেদনার ছায়া ছিল। এ

প্রসঙ্গটা আর ভাল লাগছিল না তার। এখানেই আলোচনাটা সে শেষ করে দিতে চাইছিল। দু' মুহূর্ত নীরব থেকে কি যেন ভাবল সে। তারপর হারাধনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'আরে, তুমার নৌকা যে ছাড়বে, প্রায় দু' সিকি ভাঁটা ত হইয়াল। পরে যাইতে কষ্ট হবে কিন্তু।'

'ঐ ত চালাকি করচু।' বলতে বলতে হারাধন উঠে পড়ে। সত্যি এ বেলায় নৌকো ছাড়তে না পারলে অনেক কষ্ট হবে। কথায় কথায় অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে।

জীবনের গলাটা আবার যেন আঠা আঠা হয়ে আসছে। আজ খুব তেষ্টা পাচ্ছে তার। রোদটা এখন হাত দুয়েকের মধ্যে এসে গেছে। এখনই আকাশের দিকে তাকালে ভয় লাগে। এতটা পথ যেতে আজ খুব কষ্ট হবে। বাতাস আগুনের ছোঁয়া পেয়ে এরই মধ্যে তেতে উঠেছে। জীবনের নৌকোয় তখন একটি দুটি করে লোক উঠছে। ভাঁটা শেষ হয়ে জোয়ার এলেই ছাড়বে।

'আইজ বড় কষ্ট হবে যাইতে।' নিরঞ্জন শান্ত জলের দিকে চেয়ে বলল।

'তা ত হবেই, বাতাসটা যে পড়িয়াল।' কথা বলতে জীবনের অল্প কষ্ট হচ্ছিল। তবু নিরঞ্জনের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'একটা কাজ করত, এক ঘটি জল লিয়ায়, তেষ্টায় গলা শুকি যায়ঠে।' নিরঞ্জন ঘটি নিয়ে চলে গেলে জীবন গাঙের দিকে তাকাল, দেখল, হারাধনের নৌকোটা ততক্ষণে অনেকটা দূরে চলে গেছে। হারাধনের কথাগুলো দিয়েই যেন এখন তার মনের কাজ শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যে নিরঞ্জন জল নিয়ে এসেছে। প্রথমটায় খেয়াল করেনি। পরে ঘটিটা নিজের হাতে নিয়ে মুখের ওপর তুলে ধরল। কোঁত কোঁত করে জল খেল অনেকখানি। ঘটিটা মাটিতে রাখতে রাখতে নিরঞ্জনের দিকে চোখ রেখে বলল, 'একবার নৌকার খোল-টোলটা ভাল করইয়া দেখবু, জল উঠেঠে নাকি।'

'যাই।' বলে নিরঞ্জন ঘটিটা হাতে নিয়ে বসল।

'হঁ গো বাবু, কাকদ্বীপের লৌকা কুনটা ?' একজন বুড়ো লোক জীবনের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে কতগুলো কাচের চুড়ি। ওর মধ্যে কতগুলো কালো কাজ-করা চুড়ির দিকে জীবন এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। কিছুটা যেন সে অভিভূত। বুড়োর কথাটা তার কানে যায়নি। এমনই ডুবোমন হয়ে সে চুড়িগুলো দেখছিল। কিছুক্ষণ পর বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে জীবন শুধলো, 'এ চুড়িগুলা ত খুব সুন্দর গো বুড়ার পো, কত দিয়া কিনল ?'

'বেশি লেয় নি, মাগথল অনেক। শেষকালে মাত্র ছ আনা দিচি।' বলে এই কৃতিত্বের জন্যে বুড়ো হাসতে লাগল।

'চুড়ি গুলা ত বেশ কিনচ বুড়ার পো, চোখ আছে বুড়ার। তা বুড়ী পছন্দ করবে ভাল।' বলে নিরঞ্জন হাসতে থাকে বুড়োর দিকে চেয়ে।

'ঠাট্টা মশকারী বাদ দিয়া কউ না, কুনটা ছাড়ব।'

'কিরে নিরঞ্জন, অখনও গেল নি! ভাঁটা যে শেষ হইয়ালরে!' গলায় ঈষৎ বিরক্ত ভাব ছিল।

'আইস গো বুড়ার পো।' নিরঞ্জন আর দাঁড়াল না সেখানে।

বুড়ো চলে গেলে জীবন এখন কেমন অন্যমনস্ক হলো। বেশী দিনের কথা নয়। মনে মনে ক মুহূর্ত ভাবল জীবন। মাত্তর ত পাঁচটা বছর। দেখতে দেখতে এই কটা বছর কি করে যেন একটা একটানা আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে চুপিচুপি কেটে গেল। জীবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সঙ্গে সামান্য একটু যন্ত্রণাও অনুভব করল এখন।

জীবনের বাপ ছিল এ ঘাটের মাঝি। সেরা মাঝি। একটু বয়েস হতেই বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকত জীবন। বাপ বলত, 'দেখ জীবন এসব কাজের তরে চোখ থাকা চাই। কান-মন সজাগ নাই রাখলে, বিপদ আস্‌ইয়া যখন তখন লাফ্‌ইয়া পড়তে পারে। দেখতে হয়, শিখতে হয়। আমানে হইলি গিয়ে চোদ্দ পুরুষ নু মাঝি। তর মত বয়েসে আমি এই লৌকার হাইল ধরি। তর ঠাকুর্দা আমার হাতে ছাড়্‌ইয়া দিয়া দেখত। অখনই ত রে শিখবার সময়।'

এ সব কথা কেন যেন জীবনের ভাল লাগত না। এতে মোটে পয়সা নেই! অথচ কী পরিশ্রম। কি হবে ঘাটের মাঝি হয়ে! তার ওপর প্রায়ই ওর বাপ ওকে বকাবকি করে। একটু ভুল করলে রেগে আগুন। জীবনের ভাল লাগে না এসব। সেদিন এতগুলো লোকের সামনে কটা চড় মারল! বিচ্ছিরি সব গালিগালাজ দিল! কি, না—পালটা ঘুরোতে সামান্য দেরি হয়েছিল। তার পরদিন থেকেই জীবন আর নৌকোয় উঠেনি। আর ঠিক এই সময়টায়ই চন্দনেশ্বরের মেলা সবে শুরু হবো হবো করছিল। নৌকোয় না যাওয়ার জন্যে জীবনকে অবশ্য বাপের হাতে বেদম মার খেতে হয়েছিল। তবু সে নৌকোয় গেল না। কিছু পয়সা আয় করার একটা ফন্দি হঠাৎ ওর মাথায় এল। বুদ্ধিটা হারাধনই তাকে দিয়েছিল। মেলায় বসবে ঠিক করল।

তারপর সত্যি সত্যিই জীবন একদিন মেলায়, কাচের চুড়ি, পেতলের রং-করা আংটি, ছেলেমেয়েদের খেলনা, ঝুনঝুনির একটা দোকান দিয়ে বসল। আর সেই মেলাতেই একদিন লগেন বরের সঙ্গে তার আলাপ। ওর বাবাকেও চেনে লোকটি। শুধু চেনেই না, এক সময় যে ওদের মধ্যে পরিচয়টা অন্তরঙ্গ, নিবিড় ছিল, জীবন তা বুঝতে পারল। লগেন জেঠারা লাটে থাকে। হারাধনের বাড়ির কাছাকাছি। হারাধনই সঙ্গে করে জীবনের দোকানে তাকে নিয়ে এসেছিল। সঙ্গে লগেন জেঠার মাইঝিও ছিল।

'কি গো, তুমি আমাদের পরাণের বেটা না?'

'হঁ।' জীবন মাথা তুলেছিল। চোখেমুখে তখনও বিস্ময়ের ঘোর। পেছনে হারাধন ছিল। হারাধনই এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর ওর মুখের দিকে চেয়ে লগেন জেঠা বলেছিল, 'অমন নামকরা বাপের বেটা হয়ে শেষকালে এ ব্যবসা কেনি?'

জীবন উত্তরে কিছু বলল না। মাথা নীচু করে থাকল।

'আরে সন্ধ্যা, এসা আয়। অকে একটু তুমার ওদিকে বুসতে দাও না। আর হাঁটতে পারচে না ও।'

জীবন বসবার জায়গা করে দিল।

'বাপু, অকে ভাল দেখ্ইয়া খানকতক চুড়ি দাও ত, চুড়ি পরবার খুব সখ হইচে অর। তা তুমি অকে চুড়ি পরাও, আমি আর একটা জিনিস লেইসি। যাব আর আইস্‌ব। আয় হারাধন।'

ওরা চলে গেলে জীবন সন্ধ্যার দিকে তাকিয়েছিল। এই প্রথম পরিপূর্ণ চোখে সে ওকে ভাল করে দেখল। হারাধনদা অনেক আগেই তাকে এর কথা কয়েকবার বলেছিল। একেবারে মিথ্যে বলেনি। দেখতে ভালই।

সন্ধ্যার সর্বাঙ্গে তখনও লজ্জা জড়ানো। চোখ নীচু করে সে বসেছিল। জীবন তার দিকে চেয়ে সামান্য নরম গলায় বলল, 'কুন্‌টা তুমার পছন্দ হয় গো দেখ।'

সন্ধ্যা শাড়ির আঁচলটা মুখে নিয়ে টানছিল। আস্তে আস্তে কোমল গলায় বলল, 'যেটা ভাল হবে সেটাই দাও।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন দু'পলক স্থির গভীর চোখে সন্ধ্যাকে দেখল। তারপর ঠোঁটের ডগায় সূক্ষ্ম একটু হাসির দাগ ফুটিয়ে বলল, 'আমার দোকানের সব ভাল।'

সন্ধ্যা অল্পক্ষণ চুপ করে থাকল। পরে জীবনের চোখের ওপর স্নিগ্ধ নরম চোখজোড়া অপলক রেখে ধীরে ধীরে বলল, 'ভাল জানিয়াই ত আস্‌সি গো।' বলতে বলতে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে সামান্য হেসে চুড়িগুলো দেখতে থাকে। বেছে বেছে কটা চুড়ি বের করে আনল। দু-মুহূর্ত কি ভেবে জীবনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল, 'পরি দাও।'

জীবন ওর চোখের দিকে তাকাতে তাকাতে চুড়ি কটা হাতে নিয়ে হাত স্পর্শ করল। সন্ধ্যার চোখে তখন কেমন একটা ভীরু ছায়া। ঘন দৃষ্টি। কিন্তু পরক্ষণেই ও জীবনের দিকে চেয়ে সামান্য অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। জীবন লজ্জা পেল। তখনও সে ওর হাতটা ধরে রেখেছে। এবার ছেড়ে দিল। বলল, 'এটা ত তুমাকে ভাল মানিবে না।' জীবন কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক!

'তবে যেটা মানিবে সেটাই দাও।' সন্ধ্যা তখন মুচকি মুচকি হাসছিল।

'বাতাসটা যে বুসিয়াল মাঝিদা।' হীরা কবারই বলল।

হীরার কথা কানে যাচ্ছিল না জীবনের। তখনও সে আচ্ছন্ন, বিমূঢ় দৃষ্টি নিয়ে হীরার দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কইঠি, আর কত দেরি ছাড়তে! বাতাসটা যে পড়িয়াল!' হীরার গলার স্বর যেন কিছুটা রুক্ষ।

একটু একটু করে আচ্ছন্নতার ধুঁয়ো ঠেলে সরিয়ে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল জীবন, তখনও চোখ দুটো তার জ্বালা করছিল। হীরার দিকে চেয়ে এখন কেমন যেন সামান্য রুষ্ট, বিরক্ত হলো। হীরা যেন তাকে কাঁচা ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে।

জীবন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার দৃষ্টি এখন সতেজ, স্বাভাবিক। দেখল,—রোদটা এতক্ষণে তার পা ছুঁয়েছে। এবার উঠতে উঠতে হীরার চোখের ওপর চোখ রাখল। কোমর থেকে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে ধরাল। পরে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'হুঁ, পড়িছে তো বহুক্ষণ, এতক্ষণ তুই কাই থাইলু?'

'জোয়ার তো কতবানু (কখন থেকে) এক পায়ার বেশী হইচে।' খাটো স্বরে হীরা কথাটা বলল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জীবন কি যেন ভাবল। পরে স্বাভাবিক শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলল, 'ভাল কর্‌ইয়া সব দেখ্‌ইয়া দেখ্‌ইয়া লিচু ত?'

'হুঁ।'

'চল্ তাইলে?'

নৌকো এর মধ্যে ভরে গেছে লোকে। গরমটা এই ভরদুপুরে তির তির করে কাঁপছে। অনেকে ঘামছিল ভেতরে। জীবনের কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

নৌকোর নোঙর তুলে ফেলল হীরা। তারা লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জলের মাঝে নিয়ে আসছিল নৌকোটা। এমন সময় পারে এসে একটা লোক ব্যস্তসমস্ত, অধীর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি মরাগলিয়ার নৌকো?'

'না, সেটা তো অনেক আগে ছাড়্ইচে।'

'এটা যাবে কাইকে?'

'কাকদ্বীপ। আরে ভাব কিগো তুমি, উঠ্ইয়া আসই না। ওঠিকনু মরাগলিয়ার খেয়া পাব।' কানাই লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বলল।

হু' মুহূর্ত কি চিন্তা করল লোকটা। পরে বলল 'তবে একবার ধারে লাগাও না, সাথে মাইয়া মানুষ আচে।'

'পা চালি আসতে কও।' লগিটা টেনে নিতে নিতে মধু বলল।

বিড়ি টানছিল জীবন। বাঁ হাতে হালটাকে একটু ঘুরিয়ে দিল। বিড়ির শেষ টানটা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে যেই সামনের দিকে চোখ ফেলেছে জীবন, মুহূর্তের মধ্যে যেন সে কেমন স্তব্ধ, অনড় হয়ে গেল। হীরা জীবনের চোখের দিকে চেয়ে বলল, 'আরে চুপ করাইয়া হাইল ধরাইয়া আচ যে, হালটাকে একটু ঘুরাও না।'

জীবন এবার হীরার চোখে চোখে তাকাল। সামান্য লজ্জা পেয়েছে যেন সে। হীরা তার কাছে এসে আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'তুমার গা কি ভাল নাই আইজ?'

'না না ঠিক আচে।' সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল জীবন। তারপর মধুর দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'অন্‌কে ক, এ পাশটায় ঘুর্ইয়া বসতে।'

'কান্‌কে?'

'ওই যেরে, পরে যানে (যারা) উঠল।'

'তুমানে সে ডালিতে ভর দিয়া বুস গো।'

জীবন সামনের দিকে চাইল। এ ধারটায় আরো অনেক মেয়েলোক বসেছে। মুহূর্তে সে তাকে চিনতে পেরেছিল। এখন সেদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল জীবন, ও জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে কি যেন একটা গভীরভাব ভাবছে। জীবন দীর্ঘ করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর একটু একটু করে সেখান থেকে কাতর দৃষ্টিটা সরিয়ে আনল। সত্যি, বড় দুর্বল লাগছিল তার নিজেকে। আরো

কটা দিন ঘরে থাকলে পারত। মাথাটা এখনও সময় সময় ঝিম ঝিম করে।

'কি গো মাঝি ভাই, আইজ যে লৌকা মোটে লড়তেই চায় না।' ভেতর থেকে একজন বলল।

'হঁ, যাইতে খুব কষ্ট হবে আইজ। বাতাসটা যে একেবারে পড়িয়াল।' কানাই জবাব দিল।

আস্তে আস্তে নৌকো এগোচ্ছিল। ভেতর থেকে একজন হাসতে হাসতে বলল 'এতবড় গাঙ আর ওই পুঁচকে মাঝি, আর সময়টাও ত ভাল না। কে জানে আইজ কপালে কি আছে।' ওর পাশেই ছিল একজন মাঝ-বয়েসী লোক। জীবনকে সে চেনে। লোকটির দিকে ও তাকিয়ে হাসল একটু। হাসিটা যেন লোকটির এ মন্তব্যকে উপহাস করছিল। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'মশায় এ পথে বোধ হয় লোতন?'

পরে ওই মাঝ-বয়েসী লোকটা জীবনের ঠাকুর্দা, বাবা ও জীবনের খুব প্রশংসা করছিল।

লোকটা একেবারে চুপ করে গেল। জীবন এখান থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিল। আর একবার চোখ ফেরাল ওদিকটায়। দেখল, একটি বউ তখনও ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়োর কথার সঙ্গে যেন ওকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে। তারও চোখমুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। জীবন একসময় চোখ নত করল। তার কেন যেন এখন একটা কথাই মনে হচ্ছিল, মেয়েটির দৃষ্টিতে গভীর এক অভিযোগ বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

জীবন যেন ক্রমশ আরো ম্লান, দুর্বল হয়ে আসছে। তার চোখের সামনে হঠাৎ মেলার ছবিটা যেন এই মুহূর্তে জীবন্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে।

মেলা থেকে আসার পর কিছুই ভাল লাগছিল না তার। মনের মধ্যে শুধু তখন একটা বিচিত্রবর্ণ, বাহারে প্রজাপতি ফরফর করে উড়ছিল। যন্ত্রণা ছড়াচ্ছিল। রথের মেলায় আসবার জন্যে সন্ধ্যাকে

সে বারবার করে বলে দিয়েছিল। সন্ধ্যাও আসবে বলে মাথা নেড়েছিল। তবে এবার আর অত দূরে নয়। মেলাটা বসবে ওদের বাড়ির কাছেই।

জীবনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। কিন্তু সন্ধ্যা তার কথা রাখেনি। তারপর একদিন কি মনে করে জীবন ওদের বাড়ি গেল। তখন বর্ষাকাল। বিকেলের দিকে আকাশে প্রচুর কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। বাতাস ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। ঠিক সেই সময়েই জীবন ওদের বাড়ির গোড়ায় পা রেখেছিল।

'ঘরে কে আচ গো?' গলার স্বরটা অল্প অল্প কাঁপছিল জীবনের।

'কাকে খুঁজঠ?'

'লগেন জেঠাকে।'

'সে ত ঘরে নাই। দেশ চলিচে।'

'তুমি কে গো?'

'চিনব নি আমাকে, আমি পরাণের বেটা।' একটু পরেই দরজা খুলে মুখ বাড়াল সন্ধ্যা। 'তুমি—?' সন্ধ্যার হাসি হাসি মুখে সেদিন প্রচ্ছন্ন একটা বিস্ময়বোধ ছিল।

'ঐদিকে হারাধনদার দরকে আস্‌থিলি, রাস্তায় ঝড় উঠলো তুমার দরে উঠ্‌ইয়া পড়্‌লি। জীবন সহজ হওয়ার চেষ্টা করছিল।

'ভালই করচ গো মাঝির পো। তা যা ঝড় আইল্।' কেমন যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সন্ধ্যা।

তারপর সন্ধ্যা জীবনকে নিয়ে এসে একটা ঘরে বসিয়েছিল। জীবন কোন কথা বলতে পারছিল না। কেমন একটা লজ্জা, সঙ্কোচ এসে জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। জীবন দেখল, ঘরের এক কোণায় এক বয়স্কা রমণী বসে বসে কি যেন করছে। চোখ তুলে বার বার তাকে দেখছিল। কিন্তু ভাল করে চিনতে পারছিল না। সন্ধ্যাকে সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল তার পরিচয়। সন্ধ্যা তখন

একটা বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে মুখে শাড়ীর আঁচলটা নিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসছিল।

কথার উত্তর দিতে দিতে জীবন সন্ধ্যার হাতের দিকে তাকাচ্ছিল বার বার। 'মেলায় তুমি যে কি চুড়ি পচন্দ করাইয়া দিলে গো!' সন্ধ্যা ঠোঁট কামড়ে হাসছিল।

'কেনে?'

'কদিন পরই সে মট কর্‌ইয়া ভাঙ্গিয়াল।' সন্ধ্যার গলায় ছেলে-মানুষি চপলতা ছিল।

'জীবন ওকে দেখছিল। বুড়ি, সন্ধ্যার ঠাকুমা, তখন ঘরের এক কোণায় বসে দোক্তা গুঁড়ো করছে। পাশের ঘরে কারা যেন অনুচ্চ স্বরে কথা বলছে। জীবন সন্ধ্যার চোখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে একসময় বলল, 'তুমি তো মেলায় যাওনি।'

সন্ধ্যা এখন শান্ত, জড়ানো চোখে দু' মুহূর্ত, তার দিকে চেয়ে থাকল। পরে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'যাইতে দিল নি।' সন্ধ্যাকে তখন বড় করুণ ব্যথিত দেখাচ্ছিল। একটু পরে ও সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। জীবন সেদিকে কিছুটা আহত, কাতর চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

টেনে টেনে এখন একটা নিশ্বাস নিল জীবন। অবাধ্য ছেলের মতন ওদিকটায় চুপি চুপি আবার তাকাল। তখনও ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুটো নিবিড় কালো চোখ ওকে নীরবে লক্ষ্য করছিল।

মন্থর গতিতে নৌকাটা এগোচ্ছে। শরীরটা এখন যেন সামান্য বেজুতে লাগছে জীবনের। নিরঞ্জনরা ক্লান্ত হাতে দাঁড় টেনে টেনে এইমাত্র থেমেছে। বিড়ি ধরিয়ে অল্পক্ষণ জিরিয়ে নিচ্ছিল ও আর হীরা। মধু কানাই ওরা তখনও থেকে নরম-গরম দাঁড় মারছিল। জলের ওপর তার মৃদু শব্দ ফুটছিল।

একটা ছবি এখনও জীবন মনের তলায় সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে সঙ্গোপনে, নিভৃতে সে তা দেখে। আজও এই অলস মুহূর্তের এক ফাঁকে জীবন তা প্রত্যক্ষ করে নিল।

হারাধনকে দিয়েই খবরটা পাঠিয়েছিল জীবন। সন্ধ্যার বাবা বলেছিল, 'পরাণের ঘরে মাইঝি হুব, সে তো ভাল কথা। কিন্তু বড় অভাব সে ঘরে।'

'জোয়ান মরদ, অখন তো বেশ দু'টা পইসা আয় করেঠে। অত ভয় কিসের তুমার। আর অভাবের কথা কওঠ, সে তো সব ঘরেই আছে খুড়ো, তাছাড়া জীবনের পইসা আয় করার একটা নেশা আছে।'

'তা নাইলে হইল, কিন্তু টাকা দিতে পারবু তো!'

'একটু কমসম কর্‌ইয়া কইলে পারতে পারে।'

'দেখ্‌ এই তোকে কইলি, তিনশ টাকা দিতে হবে। মাইঝি-টার তরে সামান্য গয়নাগাটি খরিদ করব।'

'আর কিচু কম কর, খুড়া, তুমার ত খুব একটা অভাব নাই।'

'আরে কয়লাপাড়ার অনন্ত দাসের বেটার তরে কইথ্‌ল, অনে্‌ (ওরা) পাঁস্‌শ টাকা দিবে।'

হারাধন ফিরে এসে পুরো ছবিটা জীবনের হাতে তুলে দিয়েছিল। মনে আছে, জীবন সেদিকে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। তারপর ছবিটা একসময় মনের গভীরে তুলে রেখেছিল। এখন জীবন অনুভব করতে পারছিল, ছবিটা এতদিনে মলিন হয়েছে।

'মাঝিদা?'

জীবনের চিন্তায় মৃদু ধাক্কা লাগল। চোখ তুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কানাই-এর মুখের দিকে তাকাল।

'হায়, চায়া দেখ।'

জীবন কপালে বাঁ হাত রেখে আকাশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার দিকে দৃষ্টি ফেলল। জীবনরা ওই কোণটাকে ঠাকুর-কোণ বলে। কি যেন সে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল ওখানে। যাত্রীদের মধ্যে একজন সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'না না আকাশ পরিষ্কার। ওটা কিচু না, হাবলা মেঘ'।

অনেক্ষণ পর জীবন চিলের মতন তীক্ষ্ণ, তীব্র চোখজোড়া নামিয়ে

আনে তারপর ইতস্ততভাবে বসা যাত্রীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তুমানে সে-পাশে সর্‌ইয়া বুস্‌ গো।'

ভেতরে বসা একজন বুড়ো মতন লোক জীবনের দিকে এতক্ষণ নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। পরে আস্তে আস্তে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'কি, কিচু দেখলু নাকি?'

'না—তবে মনে হয়ঠে—।' বলতে বলতে আবার জীবন ঠাকুর-কোণের দিকে সন্ধানী চোখ দুটো মেলে ধরল। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় জলের ওপর দৃষ্টি ফেলল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যেন এইমাত্র দেখতে পেল সে, জলের তলায় তখন বাতাসের একটু একটু শিহরণ ছড়িয়ে পড়েছে। কারো কথা তখন কানে যাচ্ছিল না জীবনের। এখন সে আর এক মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে দেহের সমস্ত জড়তা সে কাটিয়ে উঠেছে। আরো কিছুক্ষণ কান নাক সজাগ রেখে বাতাসের গন্ধ নিল। সবে একটু একটু করে বাতাস উঠছে।

'আরে, ওসব কিচু হবেনি। খালি খালি ভয় পাউঠু।' একজন যাত্রী হেসে হেসে বলল।

'হবে নি তুমানকে কে কইল, হইতেও ত পারে।'

জীবন মেয়েদের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। পরে, একটু বিরক্ত হওয়ার গলায় বলল, 'তুমানকে কইলি না, একটু সর্‌ইয়া আসতে, কথা কি কানে যায়নি?'

জীবন দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে আর একবার দেখল, সেই বউটি তখনও ঘোমটার আড়াল থেকে তাকে দেখছে। সেদিকে অল্প সময় চোখ স্থির রেখে একসময় দৃষ্টি আনত করে সে। বাতাসের গন্ধটা যেন ক্রমশ আরো উগ্র হয়ে বারুদের মতন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর স্থির থাকতে পারল না জীবন। সময় থাকতে থাকতে সব ঠিক-ঠাক করে রাখা ভাল। তারপর যা হয়। মনে মনে জীবন কোন এক দেবতার কথা স্মরণ করল। কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করল। তারপর একজনের হাতে হালটা ধরতে দিয়ে পরনের গামছাটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিল। নিরঞ্জনের দিকে

সাঙ্কেতিক দৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন একটা ভেবে নিল। কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, 'দেবানের ওখানটায় তুই রইবু নিরঞ্জন। দাঁড় আর মারতে হবেনি রে। পাউলের কাচির কাচে যা তোনে।'

'কি হইল গো তুমানকের?' ভেতর থেকে হাসতে হাসতে একজন যাত্রী মুখ বের করে।

'অখনও হয় নি গো, হবে।' নিরঞ্জন কাছিটা হাতের মধ্যে ঠিক করে নিতে নিতে জবাব দিল।

কয়েকজন যাত্রী এখন অবাক হয়ে দেখল, আকাশের ঠাকুর-কোণায় একটুকরো কালো মেঘ জমা হয়েছে। ভেতরে ততক্ষণ কথা-বার্তা কমে এসেছে। জীবন চেয়ে দেখল, মেয়েদের চোখে ভয়ের একটা ছায়া দীর্ঘ হয়ে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সবাই একটু সরেটরে বসল। সময়টা খারাপ। বলা যায় না।

জীবন বিড় বিড় করে কি যেন বলল। তারপর কটা পয়সা কপালে ঠেকিয়ে জলের মধ্যে ফেলে দিল। যাত্রীদের দিকে চেয়ে বলল, 'আধঘণ্টার ভিতরে একটা ঝড় আইস্‌বে গো। তুমান্‌কের ভয় নাই। জীবনের হাতে যতক্ষণ হাইল আছে, ততক্ষণ কন ভয় নাই গো, এই কইয়া দিলি।' জীবন ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ় বিশ্বাসের গলায় যেন কথাগুলো বলে গেল। দৃষ্টিটা কেমন বলিষ্ঠ, শক্ত।

পুরুষদের মধ্যেও যেন এতসময় পর একটা ভয়, নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে এসে তার ডানা বিস্তার করছে। যাত্রীদের মধ্যে আর কথা নেই। কেউ কেউ অবশ্য তখনও ভাবছে, ছোকরা মাঝি আর এতবড় গাঙ, কি হবে ঠাকুরই জানেন।

জীবনের এখন অন্য কোন দিকে মন ছিল। ভাবছিল, ঝড়টা এরকম সময় উঠল যে নৌকা তখন মাঝখানে। লোক ভরতি নৌকা। এর আগেও যে কয়েকবার ঝড়ে না পড়েছে তা নয়। তবু আজকে যেন অন্যরকম লাগছিল।

জীবনের এখন চোখ কান আরো সজাগ, তীক্ষ্ণ। শিকারী বাঘের মতন চোখ দুটো তার দপ দপ করে যেন জ্বলছে।

সবাই টের পেল ক্রমশ বাতাস উঠছে। কালো মেঘখণ্ডটা এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকখানি। জীবন জলের দিকে তাকাল। জলের রঙটা এখন আরো ঘোলাটে, গভীর কালো। কান খাড়া করে বাতাসের এগিয়ে আসার উল্লাস শুনল জীবন।

'তুমানে ভয় করনি গো। যে যেঠি বুসি আচ, ঠিক সেঠি বুস্‌ইয়া থাক। কুন্‌ ভয় নাই, মাথা লাড়ব নি। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল জীবন। বাপের শেখানো কথাটা স্মরণ করল। বিপদের জন্যে একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিল ওর বাপ। জীবন এখন মুহূর্তের মধ্যে আলগা, বিক্ষিপ্ত মনটা একটা জায়গায় শক্ত করে বেঁধে রাখল।

'আরে তুমানে কাঁদঠ কেনি? কইলি ভয় নাই।' ধমকের সুরে কানাই বলল।

একজনের কান্না দেখে আরো কজন মেয়েলোক ভেতরে কান্না শুরু করে দিল।

জলের ঢেউগুলো এখন বাড়ছে। জীবন সে দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে পরমুহূর্তে নিরঞ্জনের দিকে চেয়ে চেয়ে বলল, 'নিরঞ্জন দেবান শক্ত কর্‌ইয়া ধর্‌ইয়া রাখবু, বাতাসের সাথে সাথে হাত-দেড়েক সলাক তুবু।' তারপর ফুলন্ত জলের দিকে চেয়ে বিপদের সঙ্কেত জানায়ঃ ই···ই···উ···উঃ। শব্দটা চারদিকে প্রতিধ্বনি তোলে। অন্যদিক থেকেও অস্পষ্টভাবে ওইরকম সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছে জীবন। আবার মুখে হাত দিয়ে সে শব্দ করে। হে···ই···উ···উঃ। অনেক দূরে অন্য একটা নৌকো দেখতে পেল ওরা। এতক্ষণ বিন্দুর মতন ছিল। এখন তা কিছুটা বড় হয়েছে। জীবন এবার তাড়াতাড়ি করে অন্যদের দিকে উদ্বিগ্ন চোখ রাখল, 'সাথে সাথে তোনে পাউলটা ঘুরি দিবু।'

'আমানে ঠিক আচি গো মাঝিদা।'

বলতে বলতেই একটা ঢেউ নৌকোটাকে দোল দিল। তারপর আর একটা। নৌকোটা যেন পুরো দমে নাচবার পূর্ব মুহূর্তে পা ঠুকে ঠুকে নিচ্ছিল। শরীরের জড়তা অবসাদ ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

জল ফুলছে। বাতাসের শব্দটা এবার যেন বৃদ্ধের বুকভরা শ্লেষ্মার

মতন ভারী হয়ে ছটফট করছে। গোঙাচ্ছে। কজন ছেলেমেয়ে ভয়ে কান্না জুড়ে দিল। সবার মুখেই আতঙ্কের ছায়াটা এখন গাঢ় গভীর। মুহূর্তে কিছুলোক নির্বাক, স্তব্ধ।

অকস্মাৎ জীবনের দৃষ্টি পড়ল সামনের দিকে। দেখল, সবার চোখে ভয় থরথর করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, ওই বউটির চোখে মুখে একটা হাসি স্পষ্ট, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। জীবন প্রথমটায় কেমন অবাক হলো। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার কেন যেন মনে হচ্ছিল এ হাসির তলায় যেন মেয়েটির চাপা একটা অভিযোগ, অভিমান আছে। এরই জন্য যেন সে প্রতিক্ষা করছিল। তিল তিল করে সংসারের কোন বেদনাকে সে এতদিন সে জমিয়ে রেখেছিল। এখন বুঝি আর পারছে না। তারই মতন হয়তো দুঃখী। আর কিছু ভাবতে পারছিল না জীবন। মেয়েটার হাসি যেন ওকে নির্মমভাবে উপহাস করছিল। জীবন দৃষ্টি সরিয়ে আনল। এরই মধ্যে মনের দড়িকে সে সামান্য ঢিল দিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে শক্ত করল।

'আরে, কইঠি ত তুমান্‌কের ভয় নাই, তবু খালি খালি চকার—।' কথা শেষ না হতেই একটা ঝুঁটা বাতাস এসে নৌকোটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হালটাকে ঘুরিয়ে দিল জীবন।

নিরঞ্জন ও দেবান হাত দেড়েক সলাক দিয়েছিল। আচমকা প্রথম বাতাসটা সে কাটিয়ে দিল। জলের ঢেউও তখন তালগাছ প্রমাণ। সমস্ত আকাশটায় এখন মুহূর্তে কে যেন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। জীবন শক্ত মুঠিতে হালটাকে ধরে রাখল। নৌকোটা তখন মাতালের মতন টলছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় রাখছে নৌকোটাকে। হিসেবে চুল পরিমাণ ভুল হলে···

ভাবতে চায় না জীবন আর। তার নজর এখন তীব্র, শাণিত। 'চার কড়া খিচ দে দেবান।' আর একটা বাতাস আসার আগেই জীবন চেঁচিয়ে উঠল; 'আর একটু দে, আর একটু বাস।' আবার চটকা হাওয়াটা কাটিয়ে দিল নিরঞ্জন।

নৌকোটা কাত হয়ে গেছে। একটা ধার তখন জল থেকে আর মাত্তর এক কড়া ওপরে। আরো একটা চটকা বাতাস এল। প্রায় সবাই চিৎকার করে উঠল। একটা আতঙ্ক শুধু সরু সুতোর সঙ্গে ঝুলছে তখন।

কয়েকজন বমি করতে শুরু করেছে। নৌকোর ওপর দিয়ে একটা ঢেউ ভয় দেখিয়ে চলে গেছে। জীবন প্রাণপণে হালটাকে ধরে থাকল। পাশাপাশি দুটো ঢেউ-এর মাঝে পড়ে গিয়েছিল নৌকাটা। যথাসাধ্য ঢেউগুলোকে বশে রাখবার চেষ্টা করছিল সে। ওই, হাসিটা মাঝে মাঝে তাকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যেতে চায়। জীবন আবার তার বাবার মন্তরটা মনে মনে স্মরণ করল। কে একজন ভয়ে উঠে পড়েছিল। জীবন চিৎকার করে উঠল, 'কে মাথা তুলেরে? বারবার ধর্‌ইয়া কইঠি, কানে পশে নি?' মুহূর্তে নৌকোটা টাল খেল। হীরা ধমক দিয়ে বসিয়ে দিল লোকটাকে। মোচার খোলার মতন নৌকোটা তখন ঢেউ-এর মাথায় মাথায় উঠানামা করছে।

'কেউ লড়নি গো তুমানে।' আর একবার সাবধান করে দেয় জীবন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মেঘের বুক চিরে বৃষ্টি নামল। আতঙ্কের পরদাটাকে কে যেন এখন টেনে টেনে অনেক দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কালো মেঘগুলো ক্রমশই পাতলা হচ্ছে। রঙটাও চাল ধোয়া জলের মতন হয়ে এসেছে।

'আর ভয় নাই গো তুমাদের। জীবনের গলায় আশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চারদিকে তাকিয়ে এবার সে দেখল, তাদের নৌকো লোহাচরের কাছে এসে গেছে। সবাই একটু একটু করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এখন জীবনের মনে হলো, চোখ দুটো তার জ্বালা করছে। হাতটাও কেমন অবশ অবশ। ঘোড়ামারা পেরিয়ে তারা কাকদ্বীপের ছোট নদীতে পড়েছে ততক্ষণে।

বিষণ্ণ, ক্লান্ত বৃষ্টিভেজা দৃষ্টিতে জীবন আর একবার শেষবারের মতন ওদিকটায় চোখ ফেরায়। কারো চোখে মুখে আর আতঙ্কের ছায়া নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার রোদ ঝরে পড়ছে। রোদে রোদে সব আবার ভেসে যাচ্ছে। জীবন শুধু দেখল, সেই বউটি তখনও ঘোরলাগা, ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। একটু আগেও পলকে তার চোখে মুখে যে হাসি দেখেছিল জীবন, এখন আর তা নেই। বরং চোখ দুটো কেমন ভেজা ভেজা, করুণ। জীবন কিছু বুঝতে পারল না। শুধু টের পেল, এখন বুকের মধ্যে সে সামান্য ব্যথা অনুভব করছে। বুকের হাড়ে একটা যেন ফোড়া হয়েছে। সেটা টনটন করছে।

নৌকো কিনারে লাগল। যাবার সময় ভাড়া মিটিয়ে সবাই তাকে সাধুবাদ জানিয়ে নেমে গেল। অই বউটি তখনও নামতে বাকি। সবার শেষের যাত্রী। ওর সাথের লোকটি ততক্ষণে মাটিতে নেমে গেছে। আর একবার মেয়েটি বিষণ্ণ চোখে জীবনের দিকে তাকাল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। চোখ দুটো তার ছলছল করছে যেন। তারপর একটা নিশ্বাস ছাড়ল দীর্ঘ করে। জীবনের গায়েও এসে সে বাতাস স্পর্শ করল। ফোড়ার টাটানটা এই মুহূর্তে আরও বেড়ে গেল যেন।

স্তব্ধ দৃষ্টিতে সেও তার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল জীবনের।

'আরে, খাড়া রইলু যে।' নীচে থেকে তাড়া দিল লোকটি। বিষণ্ণ পায়ে বউটি ধীরে ধীরে হেঁটে গেল কিনারে। তারপর নামতে গিয়ে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট গলায় কি যেন একটা বলতে চাইল। হাতটা ওর ছুটে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি করে ধরে ফেলল জীবন।

হাতটা এত গরম! অথচ জীবনের হাত-পা যেন ঠাণ্ডায় তখন ভয়ানকভাবে জমে আসছে। ওর হাতের এই উষ্ণতা যেন এখন জীবনকে নতুন করে বাঁচাতে চাইল। সে যেন এই মুহূর্তে কেমন বিমূঢ়, অবাক। তার বিষণ্ণ চোখ স্থির, অপলক। বেদনায় ডুবোনো।

বউটি অনুচ্চস্বরে আবার কি যেন বলতে চাইল। আর বলা হলো না, ঠোঁট দুটো শুধু থর থর করে কাঁপল। নীচে থেকে লোকটি ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ওরা চলে গেলে জীবন সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর বুকের গভীরে নিবু নিবু আগুনটা। আবার যেন নতুন করে কে উসকে দিয়ে গেল।

সময়

কদিন বাদে এই প্রথম বারান্দায় পাতা ইজি-চেয়ারটায় এসে বসলেন প্রিয়তোষবাবু। হাতল দুটোয় সামান্য ধূলো জমেছে। পরিষ্কার করে নিলেন। আজই ভাত পথ্য করেছেন। ঘুমোবেন না। যাতে জ্বরটা আবার ফিরে না আসে তারই জন্য এত সতর্ক, সাবধান ভাব। এতক্ষণ তিনি ঘরে ছিলেন। কিন্তু চোখের পাতা ক্লান্তি ও তন্দ্রায় ভারী হয়ে আসছিল ক্রমশ তাই বারান্দায় উঠে এসেছেন।

অল্প ক'দিনেই ট্যাবলেট আর মিক্সচারে মুখে কেমন এক বিস্বাদ ও তেতো স্বাদ জমেছে। মেজাজটাও ঈষৎ রুক্ষ ও কর্কশ মনে হয়। সামান্য জ্বর যে এভাবে নির্জীব ও দুর্বল করে দেবে তা তিনি ভাবেননি। আজকাল ঘরে ঘরে এ জ্বর হচ্ছে। একটু অদ্ভুত ও নতুন ধরনের জ্বরটা। ভীষণ দুর্বল করে দেয়। এখনও মনে হয় পা দুটো তাঁর অবশ। থেকে থেকে বুকটা ফাঁপা, শূন্য মনে হয়। ঘর থেকে এই ক' পা হেঁটে আসতেই বেশ হাঁফিয়ে উঠেছেন যেন। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল মুহূর্তে। বসে পড়েই চোখ দুটো তিনি বুজে ফেলেছেন। একটু পরে আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুললেন। পা দুটো ছড়িয়ে দিলেন এক সময়। হাতে পুরনো একটা ম্যাগাজিন। মন্থর আলগা ছাড়া ছাড়া মন নিয়ে তিনি চোখ বুলোচ্ছেন পাতাগুলোর ওপর। এর মধ্যেও তিনি অনুভব করলেন, কখন যেন ঘুমটা অলক্ষ্যে পা টিপে টিপে এসে চোখে আলগোছে হাত রেখেছে। দেখলেন, যে পাতাটায় এতক্ষণ চোখ রেখেছিলেন, এখনও সেখানেই রয়েছেন। অথচ মাঝের এই সময়টুকুর মধ্যে তিনি যেন অনেকখানি জায়গা পরিক্রমা করে এলেন।

ক'দিন ধরেই উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছিল এলোমেলোভাবে। আজ যেন বরাবরের চেয়ে একটু বেশী। চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন

গায়ে। এমন সময় ওঁর মা এসে কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি রে, একটা বালিশ এনে দেবো ?'

প্রিয়তোষবাবু চোখ তুলে মা-কে দেখলেন কিছু সময়। তাঁর মনে হচ্ছিল, মা এখনও তাঁকে ছোট খোকাটিই মনে করেন। সামান্য কিছু একটা হলেও ভীষণ উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়েন মা। এ নিয়ে তিনি কতদিন কত কথা শুনিয়েছেন মা-কে। তবু কিছু ফল হয়নি। কোন্ ছেলেবেলায় প্রিয়তোষবাবু তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন, আজ আর তা মনেও পড়ে না। মা-র এই সস্নেহ আঁচলের নম্র ছায়াতলেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছেন তিনি। মা-র মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়তোষবাবু। জ্যোতির্ময়ীদেবীও হাসলেন। আবার বললেন, 'কি রে, আনব ?'

'আনলে তো আরো ঘুম পাবে মা।' মা-র মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন আস্তে আস্তে প্রিয়তোষবাবু।

'না না, থাক তবে, আজ ঘুমোনাটা ভাল হবে না।' জ্যোতির্ময়ীদেবী আরো ক' পা কাছে সরে এসেছেন। বললেন, 'হ্যাঁ রে এই ঠাণ্ডায় বসে আছিস, শীত করছে না তো ?'

'না।' প্রিয়তোষবাবু মিষ্টি করে হাসলেন। তারপর মা-র দিকে স্থির চোখে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা মা, তুমি কিছুতেই কথা শুনবে না।'

'কেন রে ?' জ্যোতির্ময়ীদেবীও কিছুটা অবাক ও হাসি মুখে ছেলেকে দেখলেন। 'এখনও খালি গায়ে রয়েছ, এই না ভুগে উঠলে ক'দিন আগে।'

'আমার খুব একটা শীত করে না।' বলে আরো কাছে এলেন জ্যোতির্ময়ীদেবী। বললেন, 'মাফলারটা তো পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, ভাল করে জড়িয়ে নে না গলায়।' তারপরে নিজেই টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন।

প্রিয়তোষবাবু নীরবে সব লক্ষ্য করলেন। কিছুক্ষণ পর নরম অথচ ক্ষীণ গলায় বললেন, 'তুমি কি এখনও আমায় ছেলেমানুষ মনে কর মা ?'

'দূর পাগল, মা-র কাছে আবার ছেলের বয়েস কি রে!' মৃদু হাসলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

প্রিয়তোষবাবু নির্নিমেষে মা-কে দেখলেন কিছু সময়। তাঁর ভয় হলো, মা-র শরীর খুব ভেঙে পড়ছে; হয়তো আর বেশী দিন তিনি এই স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ পাবেন না। হঠাৎ মনটা কি এক গাঢ় বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল। সামনের পার্কটার ওপর ধীরে ধীরে তিনি ক্লান্ত, উদাস দৃষ্টিটা বিছিয়ে দিলেন। সকালের কোলাহল-মত্ততা এ সময় অনেকখানি ঝিমিয়ে এসেছে। অলস, মন্থর দুপুর।

সমস্ত পার্কটা যেন এ সময় নিঃসঙ্গ, রিক্ত। গাছের পাতাগুলো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ছিল। বড় বড় গাছগুলোর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের কাতর, করুণ সাজ। প্রিয়তোষবাবু দেখলেন, একটা গাছের প্রায় সব পাতাই ঝরে গেছে। সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে। আর দু-এক দিনের মধ্যে এটিও পাশের গাছটার মতন নিঃস্ব হয়ে অপেক্ষা করবে পরবর্তী কোন সময়ের জন্যে। একটা নিশ্বাস বেরিয়ে এল আস্তে আস্তে। উড়ে এসে তখন ক'টা কাক বসেছে একটা শুকনো মরা ডালে। সামান্য সময় চীৎকার করল ওরা। তারপর ঝিলের ধারে মাটিতে নেমে এল। পার্কে তখনও দু-একজনকে মুমূর্ষু, নির্জীব আলোয় পিঠ দিয়ে ঝিমোতে দেখলেন। বেড়ার ধারের মাদার গাছ-গুলোর পাতায় বাদামী রং ধরেছে। দুটো কাঠবেড়ালি মরা ঘাসের ওপর এই নিঃসঙ্গ দুপুরে খেলা করছিল। কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে একসময় দৃষ্টি ছোট করে আনলেন প্রিয়তোষবাবু। সমস্ত শরীরে একটা জড়তা ও আড়ষ্ট ভাব। জ্যোতির্ময়ী দেবী তখনও নির্বাক হয়ে পার্কের এই মলিন, রুগ্ন চেহারা দেখছিলেন। তাঁকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রিয়তোষবাবু ধীর গলায় শুধোলেন, 'এভাবে দাঁড়িয়ে এখনও ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ তুমি?' জ্যোতির্ময়ী দেবী ঘুরে দাঁড়ালেন। তিনি কিছু বলার আগে প্রিয়তোষবাবু আবার বললেন, 'এবার ঘরে গিয়ে একটু শোও গে।'

'শুয়েই তো ছিলাম এতক্ষণ, ঘুম আসে না, ছটফটানিই সার।'

'তবু ঘরে যাও তুমি, গায়ে এখন কিছু একটা দাও, বাতাসটা ভাল না।'

'কিছু রাখতে পারি না গায়ে, বড় অস্বস্তি লাগে, শরীর কুটকুট করে।' বলতে বলতে একদৃষ্টিতে ছেলেকে দেখলেন তিনি। তারপর গায়ে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলেন। বললেন, 'না—, শরীর তো বেশ ঠাণ্ডা। আর জ্বর আসবে না।' অভিজ্ঞতার নিশ্চয়তা ফুটে উঠল কণ্ঠস্বরে।

প্রিয়তোষবাবু আর কোন কথা বললেন না কিছুক্ষণ। ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কেমন যেন পুরোনো এক স্বাদ পাচ্ছিলেন লেখাগুলোর গায়ে। একসময় টের পেলেন, মা তাঁর পাশে বসে পড়েছেন। প্রিয়তোষবাবু সেদিকে না চেয়েই শুধোলেন, 'কিছু বলবে?'

'না—, কি আর বলব। জ্যোতির্ময়ী দেবী অপলকে চেয়ে থাকলেন কিছু সময়। তারপর ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন। বললেন, 'হ্যাঁ রে পরি, দেখেছিস, দু-দিনেই পার্কটার কি দশা হয়েছে?'

'তাই তো দেখছি মা।'

'পাতা থাকলে মনে হয় যেন বয়েসই হয় নি।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'ও বেটিরও তো কম দিন হলো না।' চোখের দৃষ্টি ঈষৎ ম্লান ও করুণ হয়ে এল।

প্রিয়তোষবাবু বুঝতে পারছিলেন, কিছু একটা বলবেন তাঁর মা। এটা তারই ভূমিকা। এখনও সামান্য দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'যামিনীর বাবার বড় অসুখ, শুনেছিস?' প্রিয়তোষবাবু এরকমটাই ধারণা করছিলেন। মনে মনে মা-র সস্নেহ কৌশলটা উপভোগ করলেন। দৃষ্টি আনত রেখেই মাথা নেড়ে সংক্ষেপে বললেন, 'না।' গলা সংযত ও আবেগ-শূন্য।

'হ্যাঁ, খুব অসুখ, বোধহয় এ যাত্রা আর বাঁচবে না।' করুণ ও বেদনার্ত শোনাল গলাটা।

'কেন, কি হয়েছে ?' প্রিয়তোষবাবু মা-র চোখের দিকে তাকালেন।

'গতকাল বাজার থেকে ফেরার পথে মাথা ঘুরে নাকি পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়।' আস্তে আস্তে কথাগুলো বললেন জ্যোতির্ময়ীদেবী। মনে হচ্ছিল, এরই মধ্যে তিনি দ্বিধা ও আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন। একটা ঢোঁক গিলে সহানুভূতি ও মমতাভরা কণ্ঠে বললেন, 'মানুষটা বড় ভাল রে, বড় মাটির মানুষ।'

প্রিয়তোষবাবুর মনে হলো, এ কথা আজ পর্যন্ত মা-র মুখে তিনি বহুবার শুনেছেন। এর পরের কথাগুলোও তিনি ভেবে নিলেন।

'ওর বাবা ফেলারাম আমাদের বাড়িতে থাকত। যখন এ বাড়ির বউ হয়ে আসি, তখন থেকেই ওর বাপকে দেখেছি। আমি তো বলতে পারি, এমন সরল ভাল মানুষ আজ পর্যন্তও একটি দেখলাম না। আর যামিনীর বাবা, গোবিন্দর বয়েস তখন আর কত, তোর বাবার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। উনি আবার গোবিন্দকে খুব ভালবাসতেন।' থেমে থেমে কথাগুলো বললেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। মনে হচ্ছিল, অতীতের কক্ষে গোপন নিভৃত কথাগুলো একটি একটি করে তিনি তুলে আনছিলেন। কেমন উদাস ও ব্যথাতুর দেখাচ্ছিল তাঁকে, সামান্য অন্যমনস্কও।

'তোকেও কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, সে-সব কথা তোর মনে নেই এখন।' জ্যোতির্ময়ী দেবী এবার প্রিয়তোষবাবুর চোখে চোখে চাইলেন।

'বেশ তো, কি বলবে বলে ফেল না।'

'ও আর খুব সম্ভব বাঁচবে না রে।' কাতর ও বিমর্ষ শোনাল গলার স্বর।

'বয়েসও তো কম হলো না।' চোখ না তুলেই বললেন প্রিয়তোষবাবু।

'হ্যাঁ, তা তো হয়েছেই।' অন্য দিকে তাকালেন তিনি।

'তুমি মিছিমিছি ভাবছ মা, যা হবার তা হবেই। সংসারে এমন অনেক কিছুই আছে, যা আমাদের ক্ষমতা, আয়ত্তের বাইরে। সেখানে করার কিছু নেই আমাদের।

বোঝা গেল না তাঁর কথাগুলো জ্যোতির্ময়ী দেবী শুনলেন কি না। একসময় জিজ্ঞেস করলেন, 'একবার যাব দেখতে?'

'বেশ তো যাও, তবে সন্ধ্যের আগেই ফিরবে কিন্তু।'

'অমিতকেও সঙ্গে নেব।' বলে উঠে দাঁড়ালেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'পরি, কটা টাকা হবে তোর কাছে?'

প্রিয়তোষবাবু এরকমই আশঙ্কা করছিলেন। এবার চোখ তুললেন। সামান্য বিস্ময় ও কৌতুক নিয়ে মা-কে দেখলেন ক' মুহূর্ত। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'কেন?'

'ওকে দেব।'

'এভাবে আর কত ওকে দেবে।' একটু থেমে বললেন কথাটা।

'ঘুম থেকে উঠেই ওর মেয়েটা এল ক'টা টাকার জন্যে। এত না করলাম, কিছুতেই শুনল না। এমন জোঁকের মতন ধরল!' প্রিয়তোষ-বাবুর চোখে চোখে তাকালেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

'এদিকে তোমার নিজের ছেলের কথাটা কি একবার ভেবেছ?'

'তা কি আর ভাবি না ভাবছিস, ঠিকই ভাবি। দিনকালটা কি পড়েছে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে সামান্য সহানুভূতি ও ক্লিষ্ট চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছিল।'

'ওটা শুধু মুখেই বল তোমরা। এ পর্যন্ত তো কম নিলে না।' ইষৎ বিরক্ত ও অসহিষ্ণু শোনাল। আস্তে আস্তে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে লাগলেন তিনি।

'ছেলেগুলোও তো সব হয়েছে অকালকুষ্মাণ্ড। বুড়ো বাপকে কোন্ ছেলে না দেখে।' গলায় ক্ষোভ ও চাপা বিরক্তি ছিল।

দেশভাগের অল্প পরেই প্রিয়তোষবাবুরা এখানে চলে এসেছিলেন। যামিনীর বাবা এসেছে তারও বেশ কিছু পরে। একটা বস্তিতে দুটো ঘর নিয়ে আছে। প্রায়ই এখানে আসে লোকটা। গল্প করে। প্রথম প্রথম লোকটার ওপর প্রিয়তোষবাবুরও সহানুভূতি ছিল কিন্তু এখন আর তা নেই, বরং ওর এই অনাহুত উপস্থিতি বিরক্তিকর,

অসহ্য। পরে সামান্য ক্ষুব্ধ ও কর্কশ গলায় বললেন, 'দেখ পকেটে কি আছে।'

'না, বেশী নেব না, আর এই বোধহয় শেষ, যামিনীর বাবা আর কোনদিন আসবে না চাইতে।' কেমন করুণ ও বিষণ্ণ শোনাল স্বরটা। জ্যোতির্ময়ী দেবী আর দাঁড়ালেন না।

এ সময়ে পাশের ঘর থেকে স্ত্রীকে বেরোতে দেখে ইশারায় ডাকলেন। সুলতা কাছে এলে প্রিয়তোষবাবু শুধোলেন, 'কি করছিলে?'

'পম্পার জন্যে একটা ফ্রক সেলাই করছিলাম। কি বলবে বলে ফেল, আরও অনেক কাজ রয়েছে। তার ওপর ঝি আসবে না আজ।'

'দেখ তো ফের জ্বর এল কিনা? গাটা ভীষণ ম্যাজম্যাজ করছে।'

'কই দেখি!' সুলতা গায়ে হাত দিয়ে তাপ অনুভব করল খানিক্ষণ। তারপর চোখের কোলে একটু কৃত্রিম ধমক ফুটিয়ে বলল, 'ধ্যাৎ, কিছুই না, খালি বাতিক। একটু থেমে চোখে চোখে চেয়ে বলল, 'এইজন্যে ডাকলে?' সুলতার চোখে কৃত্রিম হাসি, স্বরে ঈষৎ কৌতুক।

'এক গ্লাস জল দিয়ে যেও।'

সুলতা চলে গেলে প্রিয়তোষবাবু সামনের দিকে দৃষ্টিটা মেলে দিলেন। মা-র কথাটাই তাঁর মনে পড়ছিল। মা তাঁর এই বিরক্ত ভাবটা টের পেয়েছেন। হয়তো তিনি দুঃখ পাবেন। কিন্তু তাঁরও তো একটা সহ্যের সীমা আছে। কারণে অকারণে লোকটা আসবে। যখন তখন হাত পাতবে। 'প্রিয়তোষবাবু দেখলেন, উত্তরে হাওয়ায় গাছের অবশিষ্ট পাতাগুলো ক্রমাগত তখনও ঝড়ে পড়ছে। সূর্যের আলোটা ম্লান, ভেজা ভেজা। মাঠের ওপর একটা ক্লান্ত দুপুর যেন রিক্ত, নিঃসঙ্গ হয়ে তন্দ্রায় ঢুলছে। আর সেই মাঠের ওপর দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে মা-কে চলে যেতে দেখলেন। সঙ্গে অমিতও রয়েছে।

সুলতা জল নিয়ে এল। প্রিয়তোষবাবু জল খেলেন। জল খেয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন, 'খুড়োর কোন খবর শুনেছ নাকি?'

'শুনলাম তো, অবস্থা ভাল না।'

আর কিছু বললেন না প্রিয়তোষবাবু। সুলতাও চলে গেল। যামিনীর বাবার কথাটাই এই মুহূর্তে মনে পড়ছিল তাঁর। কিছুদিন আগেও এসেছিল। সেদিনই জ্বর-জ্বর ভাব নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে দেখেন, যামিনীর বাবা বসে আছে। ওই তার শেষ আসা। অথচ সেদিন অনেক দুঃখ-বেদনা নিয়ে লোকটা চলে গেছে।

তাকে দেখেই প্রিয়তোষবাবু তিক্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আবার কি মনে করে?'

অসহায় করুণ মুখ তুলে ও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল অল্পক্ষণ। তারপর সরলভাবে হেসেছিল। মৃদু গলায় বলেছিল, 'রোজই তো আসি। খালি তোমার সঙ্গেই দেখা হয় না।'

'আমাকে তো কাজ করে খেতে হয়।' প্রিয়তোষবাবু জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললেন।

মা ঘরের মধ্যে। সঙ্গের বারান্দায় যামিনীর বাবা। অমিত আর পম্পা ওকে ঘিরে বসেছিল।

'তুমি চুপ কর না বাবা।' পম্পা গম্ভীরভাবে বলল।

'তারপর কি হলো দাদু, সাধু এল।' অমিতের যেন তর সইছে না। শেষ শব্দটাও ধরিয়ে দিচ্ছে।

'খুড়ো চুপ করে কেন গো।' সুলতা রান্নাঘর থেকে বলল। চায়ের জল ফুটছিল কেটলিতে।

'শেষে তুমিও ওদের দলে ভিড়লে?'

'না ভিড়ে উপায় কি বল, কী মজার মজার গল্পই না জানে খুড়ো।' সুলতা কেটলিটা নামাল।

'আমাকে একটু চা দিও তো। গা হাত পা খুব ব্যথা করছে। নির্ঘাত জ্বর আসবে।'

কি যে শরীর করেছ, 'দু-দিনও যদি ভাল যায়।' সুলতা উঠে এল। গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'হুঁ, জ্বর তো দেখছি এসেই গেছে। কিছু খেয়েছ নাকি?'

'না ভাবছি চায়ের সঙ্গে একটা ট্যাবলেট খাব।' পকেট থেকে একটা ট্যাবলেট বের করতে করতে বললেন, 'চায়ের সঙ্গে পারলে একটু আদার রসও দিও তো।'

'আচ্ছা।'

'আজ আবার কি গল্প বলবে খুড়ো।' প্রিয়তোষবাবু কাছে এসে শুধোলেন।

'বাবা না খালি খালি কথা বলবে।' অমিত যেন সামান্য বিরক্ত হয়েছে। 'দাদুও না কেমন যেন। বাবা এল তো ব্যাস বন্ধ।' পম্পা ঠাকুমার গা ঘেঁষে বসল।

'এই তো শুরু করবে মা, চা-টা খেয়ে নিক।'

সুলতা টেবিলের ওপর চায়ের কাপটা রেখে চলে আসছিল। প্রিয়তোষবাবু ডাকলেন, 'খুড়োকে দিয়েছ?'

'দিচ্ছি।'

চায়ে চুমুক দিলেন প্রিয়তোষবাবু। একটা ট্যাবলেট মুখে ফেলে ইঙ্গিতে আর একটু দাঁড়াতে বললেন সুলতাকে।

'কি বলবে তাড়াতাড়ি বলে ফেল, ওদিকে আবার কাজ পড়ে আছে একগাদা।'

চায়ে আর একটা চুমুক দিয়ে আস্তে লঘু গলায় প্রিয়তোষবাবু বললেন, 'আবার কিছু চেয়েছে-টেয়েছে নাকি?'

'এখনও তো কিছু বলেনি, আর এই তো তুমি আসবার কিছুক্ষণ আগে এল।'

'আজ চাইলে কথা শুনবে। তোমাদের প্রশ্রয় পেয়েই ওর লোভ আরো বেড়েছে।'

'আমায় বলছ কেন, যা বলার মা-কে বল। সুলতা আর অপেক্ষা করল না। রান্নাঘরে এসে অন্য কাপে চা ঢালল। এই নিন খুড়ো, চা খেয়ে ভাল দেখে একটা গল্প বলবেন আজ।'

'মা—' বুড়ো সুলতার মুখের দিকে করুণভাবে তাকাল, 'একটা কিছু দাও না এর সঙ্গে, বড় খিদে পেয়েছে।'

'কিছু আছে কি এখন, দাঁড়ান দেখি।'

'আহা রে দেখ না একবার বউমা, কিছু একটা আছে কিনা'। জ্যোতির্ময়ী দেবী সুলতার দিকে চেয়ে বললেন।

সেই কোন সকালে একমুঠো খেতে দিয়েছে, খিদে আর একদম সইতে পারি না গো বউঠান। বুড়োর গলা ক্ষীণ ও নরম শোনাল।

সুলতা বড় ঘরে এলে প্রিয়তোষবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। মুচকি হাসলেন তিনি। সুলতাও।

'এই শুরু হলো।' মৃদু করে বললেন প্রিয়তোষবাবু।

'তুমি না—!' চাপা গলায় ধমক দিল সুলতা।

'এবার মানে মানে সরতে বল।'

'তুমিই বল না, আমার ওপর দিয়ে কেন?' মনে হলো সামান্য বিরক্ত হয়েছে সুলতা।

জেলি মাখিয়ে দু'টুকরো পাঁউরুটি এনে দিল।

'এই দিয়েছে, আগে খেয়ে নাও দাদু।' পম্পা মাথা নাড়িয়ে বলল।

'হ্যাঁ, আগে খেয়ে নাও।' বলে অমিত হেসে ফেলল। তারপর সকলের মুখের ওপর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আনল।

'খুব ফাজিল হয়েছিস, না, ডাকব একবার তোর বাবাকে? শাসনের ভঙ্গিতে তাকালেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

'বারে, কি করলাম আমি।' তখনও হাসছিল অমিত।

'আবার কি করলাম হচ্ছে!' বিরক্ত চোখে চাইলেন উনি ওর দিকে।

'আঃ, থাক না বউঠান।' যামিনীর বাবা গোবিন্দ চায়ে চুমুক দিল!

'ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মতনই থাকবে এ কোন দেশী শিক্ষা।'

'এই রে, আম্মা চটেছে।' আস্তে করে বলল অমিত।

'ফের—?' এবার জোরে ধমক দিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী।

'চুপ কর্ না দাদা।'

জ্যোতির্ময়ী দেবী অন্য প্রসঙ্গে এলেন। বললেন, 'বউ যে তোমার সঙ্গে এমন করে, যামিনী কিছু বলে না এজন্যে?'

'কি আর বলবে, উল্টে আমার ওপরই হম্বিতম্বি। ওদের এত কষ্টের মূলে নাকি আমি। কি সব কথার ছিরি।'

'তা হলে তো খুব কষ্ট তোমার!'

'তবে আর বলি কি?'

'মাধবী তো আসে, তার কাছে গিয়েও তো থাকতে পার ক'দিন?'

'আর মাধবী, আমার সবই সমান। আসলে কি জানেন, বউঠান আমার কপালটাই মন্দ।'

'আজকাল আর সরল মানুষের ভাত নেই। তোমাকে দেখলে এই কথাই খালি মনে হয় আমার।'

একটা নিশ্বাস ছাড়লেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোট ছেলে কিছু করে না?'

'কি আর করবে, ইস্কুলের বেড়াটাই পেরোতে পারল না তিন তিন-বারে।' নীরবে বাকি চাটুকু শেষ করল গোবিন্দ। কাপটা এক পাশে সরিয়ে রেখে থেমে থেমে বলল, 'এ বয়েসে চলাফেরা করতে বড় কষ্ট হয়। তবু ফাইফরমাশের শেষ নেই। মুদির দোকান, বাজার, যখন যা দরকার সবই এই ভাঙা কুলো বুড়োটার ওপর। অথচ পান থেকে চুন খসলে আর রক্ষে নেই।' এখানে থামল গোবিন্দ। একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'বলুন না, এ শরীরে আর দিতে চায়? তার ওপর আমি যে একটা বাপ, এ কথাটাও ওরা ভুলে যায়।' গোবিন্দের গলা ভিজে এসেছিল। চোখেমুখে গভীর এক যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। 'দুবেলার খাবারটুকু বন্ধ করে দেবে বলে দিনরাত শোনায়। কবে যে ভগবান চোখ তুলে চাইবেন।' চোখে জল এসে গিয়েছে তার।

'এতটা অমানুষ হয়েছে ওরা?' গলায় গভীর বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছিল জ্যোতির্ময়ী দেবীর।

'নিজের হাতখরচের জন্যেও দু'টো পয়সা পাই না।' এবার কাপড়ের একটা কোণা দিয়ে চোখের জল মুছল গোবিন্দ।

'কেঁদো না যামিনীর বাবা, একভাবে চলেই যাবে। জীব দিয়েছেন যিনি, আহারও তিনিই দেবেন। অত ভাববার কি আছে।' বলতে বলতে তাঁরও চোখ সজল হয়ে এল।

'না, কাঁদব কেন, সবই আমার কর্মফল।'

সুলতা রান্নাঘরের চৌকাঠে পা রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রিয়তোষবাবু একবার তাকালেন সেদিকে। চোখে চোখ পড়তেই ইঙ্গিতে ডাকলেন একবার। সুলতা কাছে এসে অনুচ্চস্বরে শুধলো, 'কেন?'

'এই কিন্তু প্যানপ্যানানি শুরু হলো।'

'ও এই, ভাবলাম কি না কি!' সুলতা চলে এল ঘর থেকে।

'আমি যাই বাবা! আজ আর গল্প শুনব না। শুধু শুধু বসিয়ে রাখল এতক্ষণ।' পম্পা নড়েচড়ে বসল।

'কেন হবে না, এই দেখ না শুরু করছি।' গোবিন্দ হাসল সরলভাবে। তারপর অমিতের মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'আজ না, খুব একটা মজার গল্প বলব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল দেখে একটা।' অমিত খুশি হয়ে উৎসাহে আরো কাছে এগিয়ে এল।

গোবিন্দ সকলের ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে আনল ধীরে ধীরে। তারপর নীরবে মনে মনে সে গল্পটা একবার ভেবে নিল। আস্তে আস্তে একসময় বলতে শুরু করে। বলবার ধরণ দেখে মনে হচ্ছিল, অনেক দিনের সঞ্চিত কোনো ভাণ্ডার থেকে একটি একটি করে শব্দ যেন সন্তর্পণে তুলে আনছে সে।

'বুঝলি, একবার যমরাজ আর তাঁর এক বন্ধুর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। পৃথিবীর লোকজনদের নিয়েই তাঁরা আলাপ করছিলেন। এর মধ্যে এক ফাঁকে যমরাজের বন্ধু বলল: দেখ, আমি গিয়ে তোমার পৃথিবীতে একবার কিছুদিনের জন্যে থাকতে চাই, তুমি কি বল। যমরাজ হাসলেন একটু। হেসে বললেন: বেশ তো তুমি গিয়ে থা করে

এ আর এমন কি। কিন্তু একটা কথা, সময় হলে গিয়ে নিয়ে আসব, মনে থাকে যেন।

একটু সময় তাঁর বন্ধু যেন কি ভাবল। তারপর বলল : তোমাকেও যে একটা কথা রাখতে হবে। যমরাজ তাকালেন এবার : কি কথা ? : এমন কিছু জরুরী নয়, তবে তুমি যখন আমায় নিয়ে আসার জন্যে দূত পাঠাবে, তার আগে চিঠি লিখে আমায় একবার জানিয়ে দেবে। আমি তৈরী হয়ে থাকব।

যমরাজ হেসে ফেললেন। বললেন : 'এ আর কি কঠিন কাজ।' এ পর্যন্ত বলে গোবিন্দ থামল।

তারপর পম্পার দিকে চেয়ে অল্প হাসল। বলল, 'দাঁড়াও গো দিদিভাই, একটা বিড়ি ধরিয়ে নিই।' পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে অমিতের দিকে চেয়ে বলল, 'দাদুভাই, একটু আগুন দিতে বল না মা-কে।'

'আঃ তুমি না বড্ড বিরক্ত কর দাদু।' অমিত উঠে গেল। 'কি একটা গল্প বলছ, আমার বাপু যমফমের গল্প ভাল লাগে না।' পাকা পাকা গলায় বলল পম্পা।

অমিত ততক্ষণে দেশলাই নিয়ে এসেছে। বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে দু' একটা টান দিয়ে বেশ মেজাজে গোবিন্দ এবার বলল, 'তারপর বুঝলে, যমের বন্ধু তো পৃথিবীতে এসে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। খায়-দায় ফুর্তি করে। কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। আর এদিকে যত দিন যাচ্ছে, ততই যমের বন্ধুর ভাল লাগছে জায়গাটাকে। মাঝে মাঝে মনে হতো এবার হয়তো বন্ধুর কাছ থেকে কোনো চিঠি আসবে। বেশ কষ্ট হতো এসব ভাবতে। এমন করেই সে একদিন পৃথিবীটাকে ভালবেসে ফেলল। এখান থেকে চলে যেতে আর ইচ্ছে হতো না। তার মনে হতো আসবার সময় কেন বলে এল না, যখন নিজের ইচ্ছে হবে তখনই সে ফিরে যাবে। সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। বেশ আনন্দেই তার দিনগুলো কাটছিল। এসব ভাবলেই যা একটু মন খারাপ হতো। কিন্তু কি আর করবে! এর কিছুদিন পর ঠিক ওইরকম এক সকালে

অবাক হয়ে সে দেখল, তার বন্ধু দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার। রাগও হলো সঙ্গে সঙ্গে। কথার খেলাপ করেছে বন্ধু। দূত পাঠাবার আগে তো চিঠি দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। দূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল, একে বলে কিছু লাভ হবে না। ও না নিয়ে এখান থেকে সরবে না।' এ পর্যন্ত বলে গোবিন্দ বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে ফেলে দিল। সোজা অমিত পম্পার দিকে চেয়ে বলল, 'বুঝতেই পারছ, এরকম হলে কার না রাগ হয়।'

'এখানে যমরাজেরই তো দোষ, কথা দিল, রাখল না কেন? ভীষণ মিথ্যুক না রে দাদা?' পম্পা অমিতের দিকে তাকিয়ে সমর্থন চাইল যেন।

'সেই তো বলছি, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে; যাকগে, আমাদের আর কি? তারপর কি হলো শোন।' যামিনীর বাবা এবার গম্ভীর হলো। সামান্য অন্যমনস্কও। একটু ভেবে নিয়ে বলতে লাগল, দূত তো আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল। বেজার মন নিয়ে বন্ধুও চলল পেছন পেছন। যমরাজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল তার। একবার পেছন ফিরে তাকাল পৃথিবীটার দিকে। ছেড়ে যেতে তার কান্না পাচ্ছিল। স্বর্গে ফিরে যেতে আর মন চাইছিল না। চোখে জল এসে গেল বন্ধুর। হাজার হোক অনেক দিন থেকে গেল তো এখানে। মানুষের সঙ্গে ঘর করে গেল। আর কি কোনোদিন আসতে পারবে এখানে! এসব ভাবতে ভাবতে চলছে।

যমরাজ তখন বিচারে বসেছিলেন। দূত এসে বন্ধুকে সেখানে রেখে দিয়ে বাইরে গেল। বন্ধুর দিকে চেয়ে যম হাসলেন একটু। তারপর একে একে সবাই যখন চলে গেল, যমরাজ সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। কাছে এসে কাঁধে একটা হাত রাখলেন। তারপর অল্প অল্প হেসে জিজ্ঞেস করলেন: 'কেমন কাটালে বল?'

প্রথমে কোন কথা বলল না বন্ধু। যম আবার তাকালেন তাঁর দিকে। বললেন: 'রাগ করেছ?'

: না।

ঃ কেমন লাগল বললে না তো ?

ঃ তার আগে বল তোমার সাথে কি কথা ছিল আমার ?

ঃ কি বল তো—যমরাজ আশ্চর্য হলেন।

ঃ তুমি না বলেছিলে চিঠি দিয়ে জানাবে আমায়।

ঃ সে কি, পাওনি চিঠি ?

ঃ লিখলে তো পাব।

এবার হাসলেন যমরাজ। কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিলেন আস্তে আস্তে। হাসি হাসি মুখে বললেন ঃ 'বুঝতে পারছি, খুব ভাল ছিলে ওখানে। কিন্তু বন্ধু, আর কটা দিন গেলে বুঝতে পারতে, তুমি যা ভাবছ আসলে তা নয়। এক দণ্ডও ভাল লাগত না তখন। তার কারণ তোমার কাছে আমার শেষ চিঠিটাও তখন পৌঁছে গেছে।'

এদিকে বন্ধু তো খুব অবাক হয়ে দেখল তাঁকে। বলল ঃ 'চিঠি !'

ঃ হ্যাঁ, একটা নয়, তিন তিনটে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি তৈরী হয়ে নিতে।

আমি তো আমার কথা ঠিক রেখেছি। যমরাজ তখনও হাসছিলেন। আবার বললেন ঃ 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না ?' এবার গম্ভীর হলেন। কি যেন ভাবলেন চুপ করে। আস্তে আস্তে বললেন ঃ 'তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই, তবে প্রথম চিঠিটায় লিখেছিলাম সময় হয়ে গেছে এবার তৈরী হতে থাক। কানে তখন ভাল শুনতে পাচ্ছ না। আস্তে আস্তে বধির হয়ে যাচ্ছিলে তুমি।' বলতে বলতে বন্ধুকে একবার দেখলেন যমরাজ! তার মনে হচ্ছিল, সত্যিই তো একটু একটু করে সে কালা হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কিছুই তখন শুনত না। শুনতে চাইত না। আবার বন্ধুর চোখে চোখে চাইলেন যমরাজ। মৃদু হেসে বললেন ঃ 'বল, পাও নি ?' দ্বিতীয় চিঠিটা দিয়েছিলাম মাস ছয়েক আগে। একটু থেমে আবার বললেন ঃ 'তাতে লিখেছিলাম, তুমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছ, চোখে পুরু হয়ে ছানি পড়ছে। ভাল করে তখন দেখতে না কিছুই, দেখতে চাইতে না। এবার তুমি তৈরী হতে থাক। 'বল, এও মিথ্যে ?

কোনো কথা বলতে পারছিল না বন্ধু, কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছিল। এ সবই তো ঠিক। আরো খানিকটা চুপ থেকে যমরাজ এবার গম্ভীর গলায় বললেন: 'তবু তুমি তৈরী হওনি। শেষ চিঠিটা তোমায় দুদিন আগে দিয়েছি। তাতে লিখেছি, তোমার সময় পার হয়ে গেছে, কারণ চামড়া তোমার তখন কুঁচকে ঝুলে পড়েছে। তুমি স্থবির জড়পিণ্ডে পরিণত হয়েছ। এর পরও বল, তুমি ওখানে থাকতে চাও? তা ছাড়া এরকম ভাবেই যখন সব কিছু একদিন থেমে যায়, একমাত্র তখনই সেখানে আমি আমার দূত পাঠাই, তার আগে নয়। এবার বুঝলে বন্ধু, খালি খালি তো চটে আছ আমার ওপর।' গল্প শেষ করে গোবিন্দ সকলের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টি কি এক গভীর বেদনায় নরম হয়ে এসেছে।

'বাঃ, গল্পটা বেশ তো বানিয়েছ দেখছি খুড়ো।' ভেতর থেকে প্রিয়তোষবাবু বললেন।

গোবিন্দ কিছু বলল না। অমিত পম্পা উঠে গেছে। আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে বিনীত গলায় সে বলল, 'আর একটু চা হবে বউমা?'

'একটু বসতে হবে যে, তরকারিটা উনুনে। প্রায় হয়ে এল।'

'হ্যাঁ, বসছি। রাত খুব একটা বেশী হয়নি।'

'একেবারে কমও নয় খুড়ো, আটটা বেজে গেছে বহুক্ষণ, তার ওপর শীতের রাত।' প্রিয়তোষবাবু বললেন। একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত-বিরাতে চলতে তোমার কষ্ট হয় না খুড়ো?'

'একটু হয় বই কি।' মনে হলো না প্রিয়তোষবাবুর কথার সুরটা ধরতে পেরেছে গোবিন্দ।

'রাতে বেশী বেরিয়ো না ঘর থেকে।'

'বুঝলেন বউঠান, পা দু'টো আর চলতে চায় না। ভারী হয়ে আসছে খুব।' থেমে থেমে বলল গোবিন্দ।

চা খাওয়া শেষ করে আরো খানিকক্ষণ বসে থাকল গোবিন্দ। কি একটা বলতে চায় যেন। পারছে না। উসখুস করছিল। কেমন

করুণ ও অসহায় লাগছিল। প্রিয়তোষবাবু সব লক্ষ্য করছিলেন।

'একটা টাকা হবে, বউঠান? হাতে একটা পয়সাও নেই। জানেন তো, একটু তামাক খাই। ছেলেটাকে বললাম, উল্টে মুখ করে উঠল। সঙ্কুচিত ও দীনভাবে বলল কথাটা।

'দাঁড়াও দেখি, আমাদেরও তো বাপু আর সে অবস্থা নেই।' বলে সুলতাকে ডাকলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। কাছে এলে বললেন, 'তোমার কাছে একটা টাকা হবে বউমা?'

'এখন তো নেই মা, ওর কাছে চান না, ঘরেই তো রয়েছে।'

জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রিয়তোষবাবুর কাছে এসে শুধোলেন, 'তোর কাছে একটা টাকা হবে রে?'

'বলে দাও, হবে না। দাঁড়াও, আমিই বলছি।'

'কথা শোন্ পরি।' জ্যোতির্ময়ী দেবী বাধা দিলেন। শুনলেন না প্রিয়তোষবাবু। উঠে এসে বললেন, 'দেখ খুড়ো, এভাবে যদি রোজ রোজ আমাদের বিরক্ত কর, তবে আর আসতে হবে না এবাড়ি। তোমার ছেলেরা কি করল না করল তা শুনে আমাদের কি লাভ বল। তা ছাড়া রোজদিন তোমাকে টাকা দেব, এটাই বা ভাবলে কি করে!' প্রিয়তোষবাবু রূঢ় কর্কশভাবেই বলেছিলেন কথাগুলো।

'সত্যিই তো এভাবে আর আমরাই বা কত দেব আপনাকে। সে-দিন কি আর আছে আমাদের?' বলতে বলতে সুলতা ঘরে এল। প্রিয়তোষবাবুর চোখের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আজকের মত হয়েছে, এক দিনে আর নয়।'

এর পরও খানিকক্ষণ বসে থেকেছিল যামিনীর বাবা। কোনো কথা বলতে পারছিল না। চোখ দুটো সজল, ভারী হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে চোখের পাতাগুলো ভিজে গেল। নীরবে চোখ মুছল। সামান্য হাসবার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে, কোনোরকমে অস্ফুটে শুধু বলল, 'আমি, যাই বউঠান।'

জ্যোতির্ময়ী দেবী কাছে এসে দাঁড়ালেন। একটা পুরনো ভাঙা

পাত্রে অনেক খুঁজেপেতে ক'টা পয়সা পেয়েছেন। সেগুলো ওর হাতে দিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'এভাবে আর কষ্ট দিতে এখানে এসো না তুমি।' কথাটা বলতে গিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবীর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপল শুধু।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন প্রিয়তোষবাবুর চোখের কোলে তন্দ্রা নেমেছিল। চোখ মেলে দেখলেন, পার্কে একটি দু'টি করে লোক বাড়ছে। বড় চুপচাপ বাড়িটা। সুলতা হয়তো এতক্ষণে বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছে। সঙ্গে পম্পাও ঘুমোচ্ছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। অমিত মা-র সঙ্গে গেছে যামিনীর বাবাকে দেখতে। মাঠের চেহারাটাও এখন আরো প্রাণহীন স্যাঁতসেঁতে। যে গাছগুলোর পাতা ঝরছিল এতক্ষণ, এখন দেখলেন, তার মধ্যে দু'টো এরই মধ্যে শূন্য, নিঃস্ব হয়ে গেছে। এমন করুণ, শীতার্ত চেহারা প্রিয়তোষবাবু বড় অল্পই দেখেছেন। মনটা অকারণ এক বেদনায় ভরে উঠেছে। একটা ক্লান্ত অলস শূন্যতা ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল তাঁকে। শুকনো একটা ডালে তিন চারটা কাক এসে বসল। কিছুক্ষণ বসে থেকে ওরাও চলে গেল। ওদিকে চেয়ে চেয়ে প্রিয়তোষবাবুর অন্য কথা মনে হচ্ছিল। ভরদুপুরে এক মুঠো নরম বিষণ্ণ রোদ্দুর কে যেন মরা ঘাসের ওপর শুকোতে দিয়েছিল। বিকেল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা জড়ো করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। কাঠবেড়ালি দু'টোকেও আর দেখা যাচ্ছিল না এখন। মাদার গাছের ডালে একটা বুলবুলিকে সামান্য সময়ের জন্যে জিরোতে দেখলেন। আকাশটা আগের চেয়ে আরো কালো হয়ে আসছে। হয়তো বৃষ্টি হবে। অল্প শীতও করছিল তাঁর। একসময় ঝিলের পাশ দিয়ে অমিত আর মাকে ফিরতে দেখলেন। এখান থেকে বড় ক্ষীণ দুর্বল অক্ষম বলে মনে হচ্ছিল মাকে। খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন তিনি। যেন আর হাঁটতে পারেন না। অমিত অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে থেমে পড়ছে ও।

ঘরে ফিরে অমিত সোজা প্রিয়তোষবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কিছু

বলার আগেই অমিত বলে উঠল, 'জান বাবা, দাদুর কাছে না যমের শেষ চিঠিটা এসে গেছে।' বলে নিজের মনেই হাসল ছেলেটা। সুলতাও উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন।

প্রিয়তোষবাবু শুনলেন কথাটা। নীরবে, নির্নিমেষে ছেলেকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর কখন যেন কথাটার গভীরে নেমে পড়লেন। খুড়োর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় বহুদিনের। সেই সূত্রেই ও এখানে আসত যখন তখন। গল্প করত। কোনো কোনো সময় বিরক্ত হয়েছেন তিনি। আচরণও তাঁর রূঢ়, নির্দয় হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আর কোনদিনও তাঁর কাছে আসবে না লোকটা। তার দুঃখের পাঁচালী শোনাবে না। পয়সাও চাইবে না। যাবার সময় কি ধারণা নিয়ে গেল তাঁর সম্পর্কে? শেষদিন এমনভাবে না বললে কী হতো?

এমন সময় জ্যোতির্ময়ী দেবী এসে দাঁড়ালেন পাশে। মুখ গম্ভীর। চোখের দৃষ্টি উদাস করুণ বেদনাতুর। মাঠের বিষণ্ণ আলো এসে পড়েছিল তাঁর মুখের ওপর। প্রিয়তোষবাবু মায়ের বিমর্ষ মুখের দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে নিতে ধীরে অথচ গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'খুড়ো অনেক দুঃখ নিয়ে গেছে, তাই না মা?'

'হ্যাঁ, খুব কষ্ট পেয়ে গেল মানুষটা, শেষ দিন আমরাও ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম পরি!' চোখ ছলছল করছিল তাঁর। কথাগুলো কেবলই জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। আর অপেক্ষা করলেন না তিনি।

প্রিয়তোষবাবু ঠায় বসে থাকলেন। এই মুহূর্তে খুড়োর সেই গল্পটার কথাই তাঁর মনে পড়ছিল বারবার। তবে কি ও শেষ গল্পটা তাঁকেই শোনাতে চেয়েছিল? নাকি সারা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে একটু একটু করে এই একটা গল্পই সে তৈরী করেছিল? প্রিয়তোষবাবুর অকস্মাৎ কেন যেন মনে হলো, যমরাজ শুধু তাঁর বন্ধুর কাছে নয়, আমাদের কাছেও ইতিমধ্যেই একটা নয়, দু-দুটো চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমরা এখন, শুধু বধিরই হয়ে যাইনি, অন্ধও। হয়তো এভাবেই

চলতে চলতে একসময় এক জড় স্থবির বার্ধক্যের তটে এসে আমরা পৌঁছব। বা পৌঁছে গেছি। প্রজ্ঞা মমতা সহানুভূতিকর্ষিত হৃদয়ের এক সমৃদ্ধ রাজ্য থেকে এখন আমরা কত দূর? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলেন প্রিয়তোষবাবু। হৃদয়ের চারপাশে কি আমাদের এখন বিরাট পাঁচিল? কোনো যথার্থ উত্তর পেলেন কিনা বোঝা গেল না। বিমূঢ়, ব্যথিত চোখে সামনের অস্পষ্ট, বেহুঁশ পার্কটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। এবং একসময় অনুভব করলেন, বড় ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও নিঃস্ব লাগছে নিজেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই দূরে বাদলার বিষণ্ণ অন্ধকারের তলা দিয়ে গুটিকয় মানুষকে ধ্বনি দিতে দিতে এক মহাশ্মশানের পথে চলে যেতে দেখলেন। প্রিয়তোষবাবু অভিভূত, কাতর চোখে শুধু চেয়ে থাকলেন সেদিকে। ওখানে এখন কার চিতা জ্বলছে? প্রশ্নটা ক্রমশই তাঁকে আচ্ছন্ন করছিল তখন।

অভিমন্যু

বাজারে ঢুকেই শিবু আজ আর কোন দিকে তাকাল না। সোজা মাছের জায়গায় চলে এল। তাও কুচো মাছ নয়, একেবারে ইলিশের কাছে। আজো সেই বারো টাকা কেজি। সুতরাং, দরাদরি নিরর্থক। এতে মেজাজটাই তার কেমন তিরিক্ষে, রুক্ষ হয়ে যায়। অনেক জল্পনা-টল্পনার পর যদিও বা এক-আধদিন দুঃসাহস করে এ ধরনের টুকরো-টাকরা সাধ আহ্লাদ মেটাতে চেয়েছে শিবু, কিন্তু বাদানুবাদ, উত্তেজনার পর তা আর হয়ে ওঠেনি। শেষপর্যন্ত একরাশ বিরক্তি ও তার সঙ্গে খানিক আঁশটে গন্ধ নিয়েই সে ঘরে ফিরে এসেছে। ঘরে ফিরেও তার স্বস্তি নেই। বউয়ের মুখ ভার। থমথমে ভাব। এই বুঝি ঝড় শুরু হয়! শিবুও ভয়ে ভয়ে থাকে। কোনো কোনোদিন এভাবেই কেটে যায়। আজ অনেকদিন ধরেই রত্না তাকে ইলিশের কথা বলছে। মনে করে দিয়েছে বহুবার। তবু শিবু যেন ভুলে যায়। রত্নার ভেতরে অসন্তোষ, ক্ষোভ জমতে থাকে। রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে রত্না। সামান্য কথাতেই ও সেদিন ফস করে জ্বলে ওঠে। শাশুড়ী কিছু বলতে এলে সাত কথা শুনিয়ে দেয়। তখন কাউকেই ও আর গ্রাহ্য করে না। শিবুর এই অক্ষমতা, নির্লিপ্ততা যেন ওকে আরো জেদী, আরো অসহিষ্ণু করে তোলে। কথা কাটাকাটি, চেঁচামেচিতে সারা বাড়ি তখন তোলপাড়। শিবু অসহায়। একদিকে মা বোন, অন্যদিকে বউ। রাশি রাশি নালিশ আর নালিশ। কাউকে কিছু বলার নেই তার। রাগ করে অভুক্ত অবস্থায় সে অফিসে চলে যায়। রত্নাও সারাদিন না খেয়ে কাটায়। নিজেকে তখন ও আরো নানাভাবে কষ্ট দেয়। রাগ থিতিয়ে এলে একসময় নিজের ওপর ভীষণ অভিমান হয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তখন কাঁদে। সংসারের এই ছেঁড়া, ফুটিফাটা, ময়লা ছবিটা, ইদানীং দেখতে আর মোটেই তার ভাল লাগছে না। অসহ্য। ভেতরে ভেতরে দারুণ এক অস্থিরতা

বোধ করে। ও যেন কিরকম হয়ে যায়। তখন নিজেকে আর সামলাতে পারে না। ধৈর্য কি শুধু তার বেলাতেই? তার কি শখ আহ্লাদ থাকতে নেই? সে তো মুখ ফুটে প্রায় কিছুই চায় না। একটা বাড়তি শাড়ি সায়া ব্লাউজ নেই। সিনেমা থিয়েটারও দেখে না। আজকাল প্রায়ই ও খায়-টায় না। অথচ এ-অবস্থায় না খেয়ে থাকা রত্নার পক্ষেই খারাপ। বেশী উত্তেজনা রাগারাগি ভাল নয়। মনটা সব সময়ই হাসিখুশি রাখা উচিত। মনের সুস্থতা এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী। কিন্তু জেদ চাপলে এসব তখন আর কারো মনে থাকে না।

শিবু এ নিয়ে বউকে অনেক বুঝিয়েছে। রত্নাও যে তখন না বোঝে, এমন নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় অবুঝ হয়ে যায়। সে কি ইচ্ছে করে ওকে কষ্ট দেয়! সেও যে আর পারছে না! কটা টাকা আর তার মাইনে? সরকারী অফিসের এল ডি ক্লার্ক। বাধ্য হয়ে দুটো ছেলেকে টুইশন দিচ্ছে। এত করেও কুলোয় না। ভালমন্দ দু'টো খেতে চাওয়া, এ তো আর অপরাধ নয়। শুধু রত্নার কেন, তারও তো খেতে ইচ্ছে করে। বাড়িতে ভাল মাছটাছ তো আর আসেই না। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত অশান্তি, ছি ছি, তারই লজ্জা করে। বউয়ের কাছেও সে কেমন ছোট হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে জিভের স্বাদ বদলাতে কার না ইচ্ছে করে! আগে আগে সেও তো দেখেছে, রত্নার খাওয়া-টাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কোনোরকম বিলাসিতা নেই। এটা হালের ব্যাপার। কুচো মাছ ওর একেবারে অপছন্দ। খেতে অরুচি। মাঝে একবার গলদা চিংড়ির জন্যে ও বায়না ধরেছিল। এনে তবে রেহাই। তারপর চিতল মাছের পেটি, বড় বড় কইমাছ দিয়ে তেল-কই খাওয়ার লোভ হয়েছিল। শিবু শুনেছে, পোয়াতী অবস্থায় মেয়েদের নাকি ভীষণ খাওয়ার লোভ বাড়ে। ও বেচারার আর দোষ কি। শিবু বউয়ের জন্যে কতটুকুই বা করতে পারে।

শিবুও কি আর বউয়ের জন্যে কাটা ইলিশের একটা খণ্ড আনতে

পারে না? পারে। কিন্তু তার ইচ্ছে, একদিন দেড়-দু' কেজির গোটা একটা মাছ এনে রত্নাকে চমকে দেবে। তা আর হয়ে উঠছে না। সে ভেবেছিল, মাছের দাম আরো পড়বে। লোকেও তাই বলছে। কারণ জয়বাংলার সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে সই হয়ে গেছে। মাছও আসতে শুরু করেছে। একেবারে পদ্মার ইলিশ। ভুর ভুর করছে গন্ধ। আহা, ভাবলেই জিভে যেন জল চলে আসে। কিন্তু কোথায় কি, ওপারের মাছ তো আর আসে না। শিবু আজো পর্যন্ত জয়-বাংলার মাছ চোখে দেখল না। এলেও শিবুর তা জানা নেই। সে শুনেছে, মাছের বড় বড় ব্যাপারীরা অনেক রকম কারচুপি করছে। বাধা দিচ্ছে। মন্ত্রী-টন্ত্রীদের নাকি ধরাধরি করছে। ওদের কথা হলো, সব সময়ই একধরনের অভাব জীইয়ে রাখতে হবে। তা না হলে ব্যবসা চলে না। অতএব, ওদেশের মাছটাছ আনা এখানে যতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। আনলেও পরিমাণে কম। বোঝাই যাচ্ছে, শিবুর কপালে জয়বাংলার মাছ নেই। এদিকে রত্নারও মেজাজ দিন দিন খিটখিটে হচ্ছে। কারণে অকারণে রাগ বাড়ছে। হাতগুলো রোগা, টিং টিং করছে। পেটটা দিন দিনই ফুলছে। আরো নানা উপসর্গ শরীরের আনাচে কানাচে ফুটছে।

শিবুর মগজেও নানান ভাবনার কাটাকুটি। সমস্যার পর সমস্যা। এই দুরন্ত সময়ে একা সে কটা আর সামলাবে। হিমসিম খাচ্ছে। দিনকাল যেন পলকে পাল্টে যাচ্ছে। জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে। মাসের মাঝামাঝি থেকে দিনগুলো যেন কেমন এবড়ো-খেবড়ো, টাল-মাটালভাবে চলতে থাকে। বড় বিশৃঙ্খল। খুচখাচ অশান্তি, উত্তেজনায় মাখামাখি। অথচ বড় মন্থর, ভারী। রেশন তোলার টাকাটা পর্যন্ত থাকে না। দু-একদিন আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। শিবু ভেবে ভেবে কোন কূলকিনারা পায় না! কি করবে, কার কাছে সে কর্জ চাইবে? কে দেবে? চোখে রক্ত উঠে আসে। সংসারের প্রয়োজন কি আর একটা! অজস্র। কোন ফাঁকে যে কে এসে টানাটানি করবে শিবু তা জানে না। তাকে নিয়ে যেন ওরা

লোফালুফির খেলা খেলছে। এখন সে ক্লান্ত। আর যেন পারে না। উদ্যম, উৎসাহ ক্রমশ নিবে আসে।

তার সংসারটাও একেবারে ছোট নয়। বউ, বিধবা মা, বোন, ভাই। ভাইয়ের পড়াশুনোর খরচ আছে। এবার হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দেবে। একসঙ্গে আট মাসের স্কুলের মাইনে তাকে দিতে হয়েছে। মাসে মাসে দিয়ে গেলে গায়ে লাগে না। বোনেরও বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে। গেল মাসে ওর জন্যে শাড়ি সায়া ব্লাউজ এনে দিয়েছে। কাপড়-টাপড়ের কি আকাশ-ছোঁয়া দাম! রত্নার জন্যেও সে একটা ভয়েল-প্রিণ্ট্ কিনেছে। শিবুর নিজেরও একটা ফুলপ্যাণ্ট না করলে নয়। তার ওপর অসুখ-বিসুখ তো আছেই।

ইদানীং, রত্নার জন্যে তার দুশ্চিন্তা বেড়েছে। নিয়মিত ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়। দু-তিন রকমের ওষুধ খেতে দিয়েছে। দুধ ফলটলও খেতে বলেছে। এত সে কি করে যোগাড় করবে। আবার এসময় না করলেও নয়! শেষে কোথেকে কি যে হয়ে যাবে! এক পো করে দুধ রোজ করে দিয়েছে। মাঝেমাঝে কলাটলা বা এক আধটা আপেল, বেদানা, খানিকটা আঙুর নিয়ে আসে। সব সময় পারে না। শিবুর নিজের ওপরই রাগ হয়। এর মধ্যে যে এত ঝামেলা, কে ভেবেছিল!

রত্নাও তখন কিছুতেই শুনল না। এসব ঝঞ্ঝাট, ঝকমারি কি কম! শিবু আগেভাগেই ওকে বারণ করেছিল। বলেছিল, 'দিনকাল বড় খারাপ রত্না, এখন আমাদের সংসার বাড়ানোটা মোটেই ঠিক হবে না।'

রত্না বিরক্ত হয়েছে। সামান্য ঝাঁজের গলায় বলেছে, 'এসব আর আমাকে শুনিও না তো! বিয়ের পর থেকেই তো তোমার মুখে এই এক কথা! কবে যে তোমার সুদিন আসবে, তা তুমিই জান।'

'তুমি মিছিমিছি রাগ করছ।'

'রাগের কথা বললে কি সোহাগ দেখাব!'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শিবু ওকে ফের বোঝাবার চেষ্টা করেছে, 'তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না রত্না।'

'বুঝে আর কাজ নেই আমার। তুমিই বুঝতে থাক।' রত্নার গলায় তখনো উত্তাপ।

শিবু গলার স্বর নরম করে আবার বলেছে, 'তুমিই বল না, আজকাল একটা বাচ্চা মানুষ করা চাট্টিখানি কথা!'

'চুপ কর।' রত্না ছোট করে ধমক দিয়েছে। পরে অসহিষ্ণু গলায় ফের বলেছে, 'এ সময়ে কি আর কারো বাচ্চা হচ্ছে। শুধু তোমারই মাথায় রাজ্যির দুশ্চিন্তা।'

শিবু রাগ করে না। হাসি হাসি মুখে বলে, 'শুধু হলেই হয় না, একটা বাচ্চাকে ঠিক ঠিক মতন মানুষ করার দায়িত্বও নিতে হবে।'

'নিতে হবে, নেবে।'

'বলা তো খুব সোজা। সামর্থ্যের কথাটা কি একবার ভেবেছ?'

'আমার কোন দরকার নেই ভেবে, তুমিই ভাবতে থাক।'

এর কিছুদিন পরই রত্না রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওকে খবরটা দিল। শিবু তো শুনে অবাক। শোয়া থেকে সে উঠে বসেছে। এরকম তো হওয়ার কথা নয়। এখন কি করা যায়! ভেবে ভেবে সে যেন কিছু ঠিক করতে পারল না। এই দুঃসময়ে কেউ তার সংসারে আসে, সে তা চায় না। এতদিন সে ঠেকিয়ে রেখেছিল। তাদের অজান্তেই কোন ফাঁকে যে চলে এল! সে তো এর জন্যে মনে মনে আদৌ তৈরী ছিল না। রত্না কি এতে খুশি হয়েছে? বোধহয় তা-ই। এ যে কত বড় দায়িত্ব, রত্না কি করে বুঝবে? সংসারের আবহাওয়াটা যে এই মুহূর্তে কতভাবে দূষিত হয়ে আছে, তার খবর কি ও রাখে? রাখলে আর অমন ডগমগ হয়ে কথাটা বলত না। তার ওপর রাগ করত না। এর মধ্যে কি করে যে সে তার বংশধরকে বড় করে তুলবে! মাথাটা তার ঝিমঝিম করছিল। অনেকক্ষণ পর শিবু আস্তে আস্তে বলল, 'কি করে এটা হলো?'

রত্না খুশি খুশি মনে জবাব দিয়েছে, 'দেখলে তো, যে আসার সে এলোই। পারলে কি ঠেকিয়ে রাখতে?'

শিবু আমতা আমতা করে বলেছে, 'তুমি আর একবার ভেবে দেখ রত্না, যাকে আমরা চাইনি, যাকে বরণ করার জন্যে মনে মনে আমরা তৈরী নয়, তাকে এভাবে আনাটা কি আমাদের ঠিক হবে?'

রত্না ওর কথায় খুশি হলো না। একটু উষ্মার গলায় বলল, 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

শিবু কেমন যেন চুপসে যায়। অসহায় বোধ করে! মনে হয়, কি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছে। দু-একবার সে ঢোক গিলল। খাঁকারি দিয়ে গলাটা একটু সাফ করে নিল। পরে সামান্য নীচু গলায় সে শুধোয়, 'বলছিলাম কি, একবার ডাক্তারের কাছে কিম্বা হাসপাতালে গেলে হয় না?'

রত্না ফোঁস করে উঠেছে, 'কেন?'

শিবু সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর খুঁজে পায় না। ম্লানভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে। কি যেন সে ভাবে। খানিক পরে ঈষৎ আড়ষ্ট গলায় বলে, 'ওদের কাছে বলতাম, এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে আমরা কাউকে আমাদের মধ্যে আসতে দিতে চাই না।'

রত্না থ। খানিকক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারে না। লোকটাকে এই মুহূর্তে তার ভীষণ নোংরা, ইতর মনে হয়। ওর ওপর শুধু রাগ নয়, কেমন ঘৃণাও হলো। মনে হলো, সহসা কে যেন তার মাথার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার চোখমুখ পুড়ে যাচ্ছে। শরীর জ্বলছে। খবরটা শুনে কোথায় তাকে আহ্লাদে জড়িয়ে ধরবে, কোথায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে ভালবাসায় ভালবাসায় অস্থির করে তুলবে, তা নয়; উল্টে এ-ধরনের অলুক্ষণে কথাবার্তা। কি পাষাণ রে বাবা, তার কথাটা একবার ভাবতে চায় না মানুষটা! এদিকে তার বুকটা যে দিনের পর দিন এক শূন্যতায়, হাহাকারে ভরে উঠছিল, তার খবর কি ও একবার রাখে! থাকুক অভাব, অনটন। এ থাকবেই, কোন সময়ই মিটবে না। খালি বড় বড় কথা। সব

স্বার্থপর। নিজের ওপরই একসময় তার রাগ হয়। বুকের ভেতরটা যেন কিরকম করতে থাকে। দুরন্ত এক অভিমান বুকের মধ্যে ঢেউ তুলেছে। চোখ দুটো কেমন ছল ছল হয়ে আসে। পরে অনুচ্চ কণ্ঠে রত্না বলে, 'ছি ছি, এরকম একটা কথা তুমি বলতে পারলে! তুমি, তুমি একটা আস্ত পাষণ্ড, পাষণ্ড।' বলতে বলতে গলা ধরে আসে। শেষের শব্দটা কেমন ভিজে গিয়ে নরম হয়ে হয়ে একসময় ভেঙে গেল। আর স্পষ্ট হলো না। অভিমানে, যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে ধরেছে রত্না।

শিবুও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। কিছু বলল না। এরপর আর কি বলবে সে! শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। এই মুহূর্তে ওকে কোন কিছু বোঝানো যাবে না। বুঝবে না। তবু মনে মনে ওকে বলতে ইচ্ছে হলো: তুমিও আমাকে শেষে ভুল বুঝলে রত্না। কি ভেবে কথাটা বলেছি, তুমি একবারও তা জানতে চাইলে না। উল্টে আমাকে পাষণ্ড-টাষণ্ড বলে গেলে! তুমি আমাকে না বুঝলেও, আমি তোমাকে ভুল বুঝব না। বিশ্বাস কর, তোমার মা হওয়ার আকুতিকে আমি পুরো মূল্য দিই। এতে তোমার যেমন একটা গর্ব আছে, ঠিক তেমনি, পিতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও আমার কিছু কম নয়। আমি শুধু আর একটু সময় চেয়েছিলাম। বলতে পার, এটা আমার একধরনের বিশ্বাস, মনপ্রাণ দিয়েই সন্তানকে চাইতে হয়। এর চেয়ে বড় চাওয়া সংসারে আর কিছু নেই। এতে কোনো লুকোচুরি চলে না। ঠিক কথা, এই উত্তাল অস্থির সময়ে, আমি তা চাইতে পারিনি। হয়তো চাইওনি। তার অর্থ এই নয়, কোনোদিন চাইব না। সময়ও ফুরিয়ে গেছে এমন নয়। আমি চাই না, আমাদের সন্তান বেড়াল কুকুরের মতন অবহেলায়, উপেক্ষায় বেড়ে উঠুক। বরং, আমাদের সর্বস্ব দিয়েই ওকে মানুষ করে তুলতে হবে। সেখানে কোনো গাফিলতির জায়গা নেই। এজন্যে কি আমাদের প্রস্তুতি আছে? তোমার থাকলেও, আমার মধ্যে এখনও খানিকটা দ্বিধা, জড়তা আছে। আমার মাথায়, তুমি নিজের

চোখেই দেখছ, এখনও অনেক বোঝা। যে এল না, তার জন্যে আমাদের কষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু যাকে আমরা আনব তাকে উপেক্ষা করার অধিকার আমাদের নেই। তুমি মনে করো না, এতে তোমার চেয়ে আমার আনন্দ কিছু কম। কিন্তু দুঃখ এই, আগে থেকে আমরা তৈরী থাকলাম না।

বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল শিবুর। সে-রাত্তিরে কেন জানি, ওর ভাল ঘুম হয়নি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মগজের মধ্যে উল্টোপাল্টা ভাবনার কাটাকুটি খেলা চলেছে।

এরপর আরো কমাস কেটে গেল। শিবুর মনে এখন আর কোনো সংশয় নেই। সেও মনে মনে ইতিমধ্যে অনেকটা তৈরী হয়েছে।

এরমধ্যে মাঝরাতে একদিন রত্নার ঘুম ভেঙে গেল। রাস্তায় কুকুরগুলো তখন ভীষণ চিৎকার করছে। জানালা দিয়ে ঘরে রাস্তার আলো এসে পড়েছে। রত্না বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখছিল। অন্ধকারের মধ্যে ক্রমশ সে যেন ডুবে যাচ্ছিল। তার দম আটকে আসছিল। প্রাণপণ শক্তিতে সে অন্ধকার কেটে ওপরে ভাসতে চাইছে, পারছে না। ধারে কাছে কেউ নেই যে ছুটে এসে তার হাতটা একটু ধরবে। ভয়ে, আতঙ্কে তার ঘুম ভেঙে গেল। গলার কাছে তখনো একটা ব্যথা। বুকে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। কেমন যেন অবশ অবশ লাগছে। আস্তে আস্তে শিবুকে ঠেলা দিল, 'এই, এই, ওঠ না একবার, বাইরে যাব।' বলে রত্না বিছানা থেকে নেমে এসে আলো জ্বালল।

শিবুও উঠে বসেছে। বলল, 'সাবধানে যেও।'

রত্না কলতলায় গিয়ে চোখেমুখে ভাল করে জলের ঝাপটা দিল। মাথাটা যেন গরম হয়ে গেছে। ধুয়ে নিল। ঘরে এসে জল খেল। শিবুর মুখের দিকে চেয়ে ও শুধলো, 'যাবে নাকি?'

'যাব।' শিবু নেমে এল। বাইরে থেকে ঘুরে এসে আলো নিবিয়ে ওরা আবার শুয়ে পড়ে। জানালা খোলা। বিছানার ওপর রাস্তার আবছা আলো।

রত্নার এখন কোন ভয় নেই। স্বপ্নের কথাটা সে আর মনে করতে চায় না। হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। উদ্বেগ বোধ করে। একটু চিন্তাকুল গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কি গো, আজকাল নাকি বেবী-ফুড পাওয়া যাচ্ছে না?'

শিবু ওর দিকে মুখ করে শোয়। সামান্য কৌতুক বোধ করে সে। ওর বুকের ওপর একটা হাত রেখে মুচকি হেসে বলে, 'আজকাল বুঝি এসব খবরাখবর রাখছ খুব!'

মুহূর্তে রত্নার চোখমুখে কিরকম এক সঙ্কোচ ফুটে ওঠে। পর-মুহূর্তেই ও আবার সামলে নেয়। শিবুর গায়ে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে রত্না কি ভেবে মুখ টিপে হাসে, বলে, 'বারে, রাখতে হবে না!'

শিবু আরো কাছে সরে আসে। ওর মাথায় তখন দুষ্টুমি। বুকে মৃদু চাপ দিয়ে ও বলল, 'তোমার তো এর দরকার নাও হতে পারে!'

'যাও, তোমার খালি ইয়ার্কি! বলো না গো, কথাটা কি ঠিক?'

শিবু ঠোঁটে চুমু খায়। ওর পেটে হাত বুলোয়। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আর বলো কেন, এ এক ভেল্কিবাজির খেলা শুরু হয়েছে। এই দেখছ থরে থরে সাজানো, আবার পরমুহূর্তেই উধাও। নেই তো নেই-ই!'

'তাহলে?' রত্নার কণ্ঠস্বরে কী এক ভয়, আকুলতা ফুটে ওঠে।

'এই জন্যেই তো বলেছিলাম!' একটুক্ষণ নীরব থাকল শিবু। রত্নাকে অপলকে দেখল কিছুক্ষণ। ওকে যেন মলিন, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মুখের ওপর কিসের এক দুঃখ ফুটে রয়েছে। এসব কথায় ও খুব কষ্ট পায়। শিবুর কেন যেন মায়া হয়। ওর গালে একটা আঙুল বুলোতে বুলোতে আশ্বাস দেয়, 'ভয় নেই তোমার, একজনকে বলে রেখেছি। আমাকে তো কথা দিয়েছে, দেবে।'

রত্না আশ্বস্ত হয়। উদ্বেগ কেটে যায়। আবার ওকে প্রসন্ন দেখায়। বলে, 'হ্যাঁ, আগে থেকেই সব বলে-টলে রাখা ভাল।'

শিবু একটু সময় চুপ করে থেকে কি যেন ভাবল। পরে বলল, 'ঝামেলা কি আর এক রকমের, দেখবে আরো কত হ্যাপা পোয়াতে

হবে।' শিবুর মুখের রঙও এই মুহূর্তে একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে। আরো কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল।

রত্না হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল ছুঁয়ে রেখে বলল, 'চুপ চুপ।'

শিবু অবাক চোখে চেয়ে থাকে।

রত্না হাসতে হাসতে ফের বলল, 'দুষ্টুটা সব কিন্তু শুনে ফেলেছে।' বলেই ওর একটা হাত সে টেনে নিল। হাতটা তার পেটের উপর রাখল। আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'টের পাচ্ছ কিছু?'

'না।'

রত্না হেসে ভেঙে পড়ে। বলল, 'তুমি না একটা হাঁদারাম! দেখছ না, কি রকম নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।'

ওর কাণ্ড দেখে শিবু এবার জোরে হেসে উঠল।

রত্না লজ্জা পায়। আলতো করে ওকে চিমটি কেটে দেয়, বলে, 'এই, হাসছ যে বড়!'

'হাসছি তোমার কথা শুনে। ও আবার আমাদের কথা কি শুনবে!'

'হ্যাঁ গো মশাই, শুনতে পায়, সব শুনতে পায় ওরা।'

'দূর!'

রত্না অল্পক্ষণ কি ভাবল, ভাবতে ভাবতে বলল, 'তবে আর অভিমন্যু কি করে মায়ের পেটে থাকতেই যুদ্ধের কথা শুনেছিল?'

এবারও শিবু হাসল। বলল, 'আরে, এসব তুমি বিশ্বাস কর নাকি? সেরেফ গপ্প, গপ্প।'

'তোমাকে বলেছে, গপ্প!' ওর যেন মন খারাপ হয়ে যায়। হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মনের জোর ওর নেই।

শিবু ওর দিকে কি ভেবে চেয়ে থাকে একটু সময়। পরে আদর করতে করতে বলেছে, 'তাহলে এখন থেকে তো বুঝেসুঝে কথা বলতে হয়।'

'হ্যাঁ গো, তাই বলবে!' রত্না ওর বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়।

এই করতে করতেই রত্না ন'মাসে পড়ল। সুতরাং, আর দেরি নয়।

ওর এই সাধটাই বা অপূর্ণ রাখে কেন! আজ শিবু মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে সবচেয়ে বড় মাছটাই কিনে নিয়ে যাবে। দাম যা-ই হোক না! টুকরি থেকে বেছে বেছে বেশ বড় দেখেই একটা ইলিশ মাছ বের করেছে শিবু। এর চেয়ে বড় আর নেই। দেড় কেজি ওজন। সাকুল্যে, আঠারো টাকা দাম। টাকাটা দিতে গিয়েও শিবুর বুকের ভেতরটা চড় চড় করেছে। পরমুহূর্তেই নিজেকে সে বুঝিয়েছে, একবারই তো এরকম আহাম্মকের মতন কাজটা করেছে। আর তো সহজে সে এদিকে পা বাড়াচ্ছে না। না হয়, এক সপ্তাহ আর বাজারই হবে না। তবু তো শেষপর্যন্ত রত্নার এই আবদারটাও সে রাখতে পেরেছে!

রত্নাও এমনটা ভাবতে পারেনি। কি করে ভাববে! সচরাচর এরকম দিন তো তাদের আসে না, যদি বা আসে, আহ্লাদে, ফুর্তিতে মনটা সেদিন কানায় কানায় ভরে ওঠে। সংসারের কোন মালিন্যই তখন চোখে পড়ে না। ছোটখাটো বিবাদ কলহের কথা মনে থাকে না। ওর ধারণা, ভাল খাওয়া পরার জন্যেও ভাগ্য চাই। ও কি আর সেরকম ভাগ্য করে এসেছে! মনের মধ্যে কত ইচ্ছেই তো বুদবুদের মত ফুটফুট করে মিলিয়ে যায়। তবু কখনো সখনো সৌভাগ্য তাদের ঘরেও উঁকি মারে। সান্ত্বনা এটুকুই। রত্নার কেন যেন মনে হয়, আজকের দিনটাও তেমনই একটা পয়মন্ত দিন। চোখমুখ তার খুশিতে ঝলমল করছে। কি ভেবে ও মাছটার গায়ে বার কতক হাত বুলোয়। টেনে টেনে গন্ধ নেয়। ইলিশের গন্ধটাই যেন আলাদা। শাশুড়ী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুলাও এল মার সঙ্গে। বাবলু ও-ঘরে মিনমিন করে পড়া তৈরী করছিল। সেও একবার উঁকি মেরে গেল। মাছটা সকলের মনেই যেন একটু একটু করে সুখ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাবলুর উৎসাহটা যেন আরো বেশী। চোখেমুখে চকচকে ভাব। এক দৌড়ে সে আবার ঘরে চলে যায়। হঠাৎ যেন ওর গলার আওয়াজ বেড়ে গেল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে সে তখন পড়া মুখস্ত করছে।

শাশুড়ী রত্নার মুখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে বলল, 'মাছটা খুব ভাল জাতের গো বউমা। দেখবে ওটার ডিম হবে না। ডিম হলে মাছের আর কি থাকল।'

রত্নাও সামান্য ঘাড় হেলিয়ে কথাটা সমর্থন করে। বলে, 'হুঁ, পেটের দিকটা চওড়া, মাথাটা একটু খানি।'

শাশুড়ী ফের বলল, 'মাছটার তেল উঠবে খুব।'

শিবুও কাছেই ছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'এর চেয়ে ভাল আর পেলাম না।' কি ভেবে সে রত্নার চোখে চোখে তাকাল একবার, বলল, 'আমাকে একটু চা দিও তো।' শিবু আর দাঁড়াল না! ঘরে চলে এল।

রত্না হাসি হাসি চোখে বুলাকে দেখল একপলক, বলল, 'তুমি ভাই, তোমার দাদাকে একটু চা করে দাও না। মাছটা আমি কুটে ফেলি।'

বুলাকে আজ বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও চা করতে গেল। বলল, 'তোমাকেও একটু দেব নাকি?'

'দিয়ো।'

ঘর থেকে বঁটি থালা নিয়ে এল রত্না। কি ভাবে কাটতে হবে, কটা টুকরো বের করতে হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাশুড়ী তাকে সব দেখিয়ে দিল।

খানিকক্ষণ পরে মাছ ধুয়ে-টুয়ে ঢেকে রেখে এক ফাঁকে রত্না এ-ঘরে এল। শিবু কাগজ পড়ছিল। ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল রত্না। শিবুর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন সে ভাবল একটু সময়। ঠোঁটের ওপর তার মিটি মিটি হাসি লেগে আছে। ওর কাঁধে একটা হাত রেখে নরম গলায় রত্না জিজ্ঞেস করে, 'কি ব্যাপার গো!'

শিবু কাগজ পড়তে পড়তে জবাব দেয়, 'কিছুই না।'

রত্না আলতো হাতে কাগজটা টেনে এনে একপাশে সরিয়ে রাখে। মুখ টিপে টিপে হাসে। গাঢ়, মায়া মায়া চোখে ওকে আবার একপলক দেখে নেয়। কেন যেন এই মুহূর্তে তার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে

আসে। হায় রে, এজন্যে কতদিনই না ওর ওপর সে রাগারাগি করেছে। আজ নিজেরই খারাপ লাগছে। কিরকম যেন লজ্জা লজ্জা করছে তার। দুঃখ হয়। ওর জন্যে একধরনের মমতা বোধ করে। এই বাজারে এতগুলো মানুষ তো ওকে ঘিরেই বেঁচে আছে। নিজেকে আজ বড় ছোট মনে হচ্ছে। কি ভেবে সামান্য ঝুঁকে পড়ে ছেলেমানুষের মতন হঠাৎ ওর গলাটা জড়িয়ে ধরল রত্না। বলল, 'আমার ওপর খুব রাগ করেছ তো?'

শিবুর মুখেও পাতলা এক চিলতে হাসি। ওর চোখে চোখে চেয়ে আস্তে করে বলল, 'কেন, এতে আবার রাগের কি দেখলে?' খুট করে বউয়ের গালটা টিপে দেয়। পরে ওর হাত দুটো সরিয়ে দিতে দিতে বলে, 'কি হচ্ছে, কেউ দেখবে-টেখবে!'

রত্না সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ওর গলা ছেড়ে দিয়েছে সে। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলল, 'যাক গে, কত দক্ষিণা নিল শুনি!'

শিবু হাসি হাসি মুখে বলে, 'তা শুনে এখন আর কি হবে!'

'তবু শুনি না।'

'কত আর, মাত্র আঠারো টাকা।' খুব নির্বিকার, নির্লিপ্ত গলা।

রত্না আঁতকে ওঠে। পলকে মুখের রঙ বদলে যায়। বিস্ময়ের চোখে ওকে একটু দেখল। পরে টেনে টেনে বলল, 'না না, এটা তুমি বেআক্কেলের কাজ করেছ! চারজনের জন্যে এতবড় মাছের কি দরকার ছিল! তাছাড়া, এখন একটু বুঝেটুঝে তো খরচ করবে। এর পর তো খরচ আরো বাড়বেই।'

শিবু ওর কথা শুনে হেসে ফেলেছে। হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক আছে, এবার থেকে তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

রত্নাও হেসে ফেলল, 'হুঁ, মনে থাকে যেন।'

দুজনই এবার একসঙ্গে হাসে। শিবু কাগজটা আবার তুলে নিল।

রত্না চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে ফের ঘুরে এল। কাছে এসে ওর গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলল, 'দেখছ, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

শিবু তাকাল।

রত্না শুধোয়, 'মাছের কি খাবে ?'

'তোমার যা পছন্দ, তাই কর।'

'ভাজা করছি, আর ভাপে।'

'দারুণ, দারুণ!' শিবু উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে। কি ভেবে ওর ভারী পাছায় আস্তে করে একটা চিমটি কাটে।

'এই অসভ্য।' রত্না মিষ্টি হেসে চলে যায়।

বাবলু একসময় চান খাওয়া সেরে স্কুলে চলে গেছে। শিবুও খেয়ে টেয়ে অফিস যাওয়ার জন্যে জিরিয়ে নিচ্ছে। খাওয়াটা আজ বেশীই হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছিল।

হঠাৎ রত্নার একটা চিৎকার কানে এল। এক লাফে শিবু বাইরে এল। ওর মা, বুলা ও-ঘর থেকে ছুটে এসেছে। কি ব্যাপার!

রত্না কলতলায় পড়ে গেছে।

শিবু তাড়াতাড়ি করে ওকে তুলে নিল। ওর কপালে, গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঠিকমতন কথা বলতে পারল না ও। ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। একটু একটু করে চেতনা হারিয়ে ফেলছে রত্না। প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে।

শিবু ঘাবড়ে গেল। সেও কিরকম বিমূঢ়। ভীষণ অসহায় বোধ করছিল।

তার মা ঠেলা দিয়ে ভীত, অস্থির গলায় বলল, 'দাঁড়িয়ে আছিস কেন, আগে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বুলা, ঘর থেকে তাড়াতাড়ি তোর বউদির একটা শাড়ি নিয়ে আয়।'

শিবু কোনো রকমে গায়ে জামা গলিয়ে পাগলের মতন বেরিয়ে গেল। খানিক পরে সে ট্যাক্সি নিয়ে এল। ধরাধরি করে রত্নাকে ট্যাক্সিতে তুলল। বুলা কাঁদছিল। ওর মার চোখেও জল চিক চিক করছে।

শিবুর বুকের ভেতরটা ভেঙে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন টনটন করছে।

এমারজেন্সিতে ভর্তি করে নিল রত্নাকে। এক্ষুণি নাকি অপারেশন করবে। একটা ফর্মে ওরা তাকে সই করতে বলল। কাঁপা কাঁপা হাতে সে সই করল। বুকের ভেতরে তার অসহ্য কষ্ট। চোখেও যেন ভাল দেখতে পাচ্ছে না। বারবার ঝাপসা হয়ে উঠছে। ডুকরে যদি সে একবার কাঁদতে পারত! একটা দুঃসহ কষ্ট ভেতরে ছটফট করছে। একটু পরে ওরা আবার দুটো ব্লাড রিক্যুইজিশন্ ফর্ম ওর হাতে দিল। এই মুহূর্তে দু বোতল ব্লাড চাই। শিবুর মাথায় যেন আর কিছু ঢুকতে চাইছে না। তার শরীর টলছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতন সে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করল। তার চোখের ওপর দিয়েই রত্নাকে ও.টি.-তে নিয়ে গেল। যেন ঘুমিয়ে আছে। একটা চাদর দিয়ে ওর শরীরটা ঢাকা। শিবু ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকল। তার হৃদপিণ্ডে একটা কাঁটা খচখচ করছে। কি হবে কে জানে! উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় সে কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আঠা আঠা। বুকে দারুণ এক তেষ্টা।

ডাক্তারবাবু একসময় তাকে ডাকলেন। ওই মুখের দিকে চেয়ে শিবুর বুকটা কেমন শুকিয়ে গেল। তার কথা বলার শক্তিও যেন এখন নেই। এবার ভয়ঙ্কর কোনো সংবাদ তাকে শুনতে হবে।

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'বেবীকে বাঁচান গেল না।' কথাটা বলে আর একটু সময় নিলেন তিনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর মুখের দিকে চেয়ে সহানুভূতির গলায় আবার বললেন, 'লাকি এনাফ, শেষপর্যন্ত পেসেণ্টকে বাঁচান গেল, কিন্তু···।'

শিবু অনিমেষ চোখে চেয়ে আছে। তার চোখ যেন ঝাপসা হয়ে উঠছে। বুক দুরু দুরু। এর পরও কি আরো কোনো দুঃসংবাদ আছে? তার মুখে কোনো কথা নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'দিস ইজ এ কেস অফ প্লেসেণ্টা এক্রিটা। হিস্টেরেক্‌টমি ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

শিবু কিছু বুঝল না। সে বোকার মতন চেয়ে থাকে।

ডাক্তারবাবু এবার সোজা করে বললেন, 'পেসেণ্ট আর কোনো-দিনই মা হতে পারবে না।'

ডাক্তারবাবু একসময় চলে গেলেন। শিবু তখনো বসে থাকল। উঠে দাঁড়বার মতন তার জোর নেই। চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কোনো সান্ত্বনাই তো খুঁজে পাচ্ছে না সে। এই দুর্ভাগ্য নিয়েই কি তাকে সারা জীবন কাটাতে হবে! রত্নাকে সে কি বোঝাবে? সে কি মুখ ফুটে কখনো বলতে পারবে: তুমি আর কোনোদিনও মা হতে পারবে না রত্না। এই হাহাকারে ভরা শূন্য বুক নিয়েই তোমাকে আমাকে একদিন এই সংসার ছেড়ে নিঃশব্দে চলে যেতে হবে। হায় রে!

না, না, একথা শিবু ওকে কখ্খনো শোনাতে পারবে না। কোনোদিনও রত্নাকে সে এই নিদারুণ, নিষ্ঠুর কথাটা বলবে না। এর যন্ত্রণা যে আরো কঠিন, আরো দুঃসহ! তাকে একা একাই নীরবে এ কষ্ট বয়ে বেড়াতে হবে।

এই মুহূর্তে শিবুর নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। রত্নার সঙ্গে কত ঠাট্টা ইয়ার্কির কথা তার মনে পড়ে যায়। নিজেকে কেন জানি, আজ ভীষণ অপরাধী মনে হয়। সে বুঝতে পারে না, রত্নাকে ওসব কথা বলার জন্যেই কি বিধাতা তাকে এমনভাবে শাস্তি দিলেন? তা-ই বা কেন, সে তো মনে মনে শেষপর্যন্ত তৈরীই হয়ে ছিল! ছেলেটাও বাঁচল না। ও বেঁচে থাকলেও তো দুঃখ ভুলতে পারত!

রত্নার কথাই কি ঠিক হলো? পেটের মধ্যে থাকতেই কি ও তাদের সব কথা শুনেছিল? সে জন্যেই কি অভিমান করে এমনভাবে সরে গিয়ে তাকে মুক্তি দিয়ে গেল? এ মুক্তি তো সে চায়নি! আজ কেন যেন মনে হচ্ছে, এই অশান্ত সময়ে কি পিতা হওয়ার মতন যোগ্যতাও তার নেই? ছেলেটা কি তার অক্ষমতাকেই ঠাট্টা করে গেল! রত্নার কাছে এখন কোন্ মুখে সে দাঁড়াবে? ও যখন এক এক করে তাকে সব শুধোবে, তখন সে কি জবাব দেবে? আর সে ভাবতে পারে না। মাথাটা যেন তার ছিঁড়ে পড়ছে। ঘুরছে। বুকের কষ্টটা আরো বাড়ে। মুখটা দেখতে দেখতে কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। সে হেরে গেছে। সবার কাছেই হেরে গেছে।

মনপ্রাণ দিয়ে একটি সন্তান চাওয়ার মতন সুযোগ তার জীবনে আর কোনোদিনও আসবে না। তার কেন যেন আজ মনে হয়, রত্নার মতন সেও যদি প্রথম থেকেই, এই সন্তানটিকে গভীর মমতা ভালবাসা দিয়ে চাইত, চাইতে পারত, তাহলে বোধ হয়, এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটত না! ছেলেমানুষের মতন শিবু এবার কেঁদে ফেলে। এ কান্না যেন সহজে থামবে না তার। সবে শুরু হলো!

বাঁচার জন্যে

মেডিসিন ওয়ার্ডের এ-ব্লকের আট নম্বর বেডের পেসেণ্ট মারা গেল। নাম সত্যানন্দ গোঁসাই। ফরসা গোলগাল চেহারা। বয়েস ষাটের নীচে। বোঝা যায়, বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। রোগ মায়োকার্ডি-য়াল-ইনফ্রাকসন্। বুকে ব্যথা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট। মাত্র তিন দিন আগে এসে ভর্তি হয়েছিল। আজ সন্ধ্যে সাতটা পঁচিশ মিনিটে মারা গেল। উদয়নই দেখাশুনো করছিল।

উদয়ন এখানকার জুনিয়র হাউস-স্টাফ। এ ক'বছরে অনেক রকম রুগীকে সে এখানে মরতে দেখেছে। সে নিজেও কি পেরেছে সবাইকে বাঁচাতে? পারেনি। সম্ভবও নয়। তবু কোনো কোনো মৃত্যু তাঁকে দুঃখ দেয়। ভুলতে পারে না যেন। এখন আর আগের মতন বিচলিত হয় না। অথচ মৃত্যু সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে তার এক ধরনের ভয় ছিল। এখানে এসে চোখের ওপর জীবন-মৃত্যুর এই খেলা দেখতে দেখতে তার সেই আকৈশোর লালিত ভয়টা একদিন কেটে গেল। এটুকু সে বুঝেছে, যে মরবে তাকে কোনোভাবেই বাঁচান সম্ভব নয়। এখনও এমন সব রোগ আছে, যা তারা অনেক সময়ই ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না, পারলেও যথাযথ ওষুধ হয়তো আজো বেরোয়নি। ওদের চোখের সামনেই দেখতে দেখতে জীবনের শেষ আলোটুকু কখন নিবে যায়। তাদের আর কিছু করণীয় থাকে না তখন। এ এক অস্বস্তিকর অবস্থা। খালি মনে হয়, আমরা কত অসহায়, কত অক্ষম। ইচ্ছে থাকলেও বাঁচাতে পারি না। কোনো উপায় নেই।

কিন্তু যেখানে প্রতিকার সম্ভব, যেখানে আধুনিক ওষুধপত্রের অভাব নেই, সেখানে নিজেদের কোনোরকম গাফিলতি বা ভুলের জন্যে যদি কেউ মরে যায়, তবে আর আফসোসের সীমা থাকে না উদয়নের। নিজেকে তখন ভীষণ অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, একজন মানুষ কত

নিরুপায়, অসহায় হয়ে তার কাছে বাঁচতে এল, বাঁচতও ; কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তারই ভুলের জন্যে বাঁচল না। এতে নৈতিক দিক থেকে কোনো সমর্থন পায় না উদয়ন। মনের মধ্যে তখন এই চিন্তাটাই খালি ঘুরপাক খেতে থাকে। যতদিন না থিতিয়ে আসে, কিছুতেই যেন সে স্বস্তি পায় না। আর যদি এমন হয়, চুলচেরা বিচারের পর দেখা গেল, না, এতে তাদের কোনো দোষ নেই, তারা সাধ্যমতন জ্ঞানবুদ্ধিতে যতখানি সম্ভব চেষ্টা করেছে,—তবু যে শেষপর্যন্ত বাঁচাতে পারেনি, এটা শুধু ভাগ্যের নির্মম নিয়তি ; তাহলে এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা হয় না তার।

এরকমই তার মনের গঠন। একটু স্বতন্ত্র। উদয়ন নিজেও জানে, অনেকেই তার এই বাড়াবাড়িকে আড়ালে ঠাট্টা করে। হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে। করুক। এসব কখনো গায়ে মাখে না সে। আবার এই স্বভাবের জন্যেই তাকে অনেকে ভালও বাসে। কেমন নিরহঙ্কার সাদাসিধে ছেলে। কারো ওপর কোনরকম ঈর্ষা নেই যেন। তার ব্যক্তিত্বকে সবাই সম্ভ্রম করে। ওকে যে-কোনো দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সুতরাং, তার হাতে যদি কোনো রুগীর ভার পড়ে, সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কিভাবে রুগীর মনে আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়। এ যেন অনেকটা নেশার মতন। ওর এই সহৃদয়, আন্তরিক ব্যবহার রুগীর কাছে যেন মস্ত বড় এক আশ্রয়, সান্ত্বনা। যখন কেউ সুস্থ হয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরে যায়, তখন তারও আনন্দ হয়। ভাল লাগে, নিজের এই অভিজ্ঞতার কথা ভেবে। ভাবটা যেন এই, তুমি তো বাপু মরতেই বসেছিলে, দেখ আমরা তোমাকে যমের সঙ্গে লড়াই করে ফিরিয়ে এনেছি। আবার তুমি তোমার নিজের মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছ।

তার কথা হলো, এখানে তো কেউ শখ করে আসে না। না এসে কোনো উপায় নেই, তাই আসে। কী করুণ, পাণ্ডুর সব মুখ-চোখ। দেখলে মায়া হয়। কী অস্ফুট আর্তি, যন্ত্রণা! তোমার কাছে একজন

কী করুণভাবে জীবন ভিক্ষে চাইতে এসেছে, আর তুমি তাকে অবহেলায় অনাদরে ফিরিয়ে দেবে? তুমি কি একবার সাধ্যমতন চেষ্টা করবে না? বুকের ভেতরটা যেন কেমন মোচড় দিতে থাকে উদয়নের। সে স্থির থাকতে পারে না।

কাজটা যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ, একথাটাই সেদিন তপতীকে সে বলেছিল। ওর ভাল লাগেনি। ও একটু রেগে গিয়ে বলেছে, 'হ্যাঁ, তুমিই তো এখানকার একমাত্র ডাক্তার, আর আমরা তো সব ঘোড়ার ঘাস কাটতে এসেছি।' ওর বলার মধ্যে সামান্য পরিহাস ছিল যেন।

উদয়ন ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছিল, বলেছিল, 'তুমি কিন্তু মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছ?'

'মিছিমিছি?' তপতী যেন আরো ক্ষুণ্ণ হলো। ওর রাগ করার কারণও ছিল। আগে থেকেই কথা ছিল, ওরা দল বেঁধে আজ নাইট শো-এ সিনেমা দেখতে যাবে। আগেই তাকে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিল। উদয়নও শেষপর্যন্ত রাজী হয়েছে, যেহেতু তপতী যাচ্ছে। ও না গেলে যে তপতীও যাবে না, এটা সে ভাল করেই জানে। তবু সে যেতে পারছে না। পুরো মেজাজটাই যেন নষ্ট করে দিয়েছে উদয়ন।

'তোমরা যাও না।'

'তুমি যাবে না কেন?' তপতী ওর চোখে চোখে তাকায়।

'বলছি তো আমার একটু অসুবিধে আছে।'

'কি এমন অসুবিধে শুনতে পারি না?'

'কেন পারবে না।' উদয়ন ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, 'চার নম্বর পেসেন্টের অবস্থা খারাপ, গ্যাসপিং কণ্ডিশন। এক্ষুণি আমাকে আবার ওয়ার্ডে ছুটতে হবে।'

'হুঁ, এই কথা!' তপতী খিল খিল করে হেসে উঠল। একটু পরে বলল, 'সিস্টারকে বলে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে দিয়ে এলেই তো হয়।'

'আমি নিজেই তার ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'তবে আর কি!'

'তুমি বুঝবে না, তপতী। আমাকে আজ ছেড়েই দাও তোমরা, আরেক দিন হবে।' উদয়নকে যেন একটু গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। আবার বলল, 'আমাকে এ অবস্থায় পেসেণ্টের কাছে থাকতেই হবে, তা না হলে লোকটা ভাল করে মরতেও পারবে না।'

'এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।'

উদয়ন ওর কথায় কোনোরকম রাগ করল না। হাসি হাসি মুখে শুধু বলেছিল, 'তোমার যা খুশি বলতে পার।' একটু সময় চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'এটা কেন একবারও ভাবছ না তপতী, আমি কাছে থাকলে লোকটা ভরসা পায়। আমার হাত ধরে কাকুতি মিনতি করে বলেছে, আমি যেন ওর কাছে কাছে থাকি। মরবার সময় ও-বেচারা একটা অবিশ্বাস নিয়ে যাবে, তা কেন?'

'থাক, তোমার আর লেকচারের দরকার নেই।'

'লেকচার নয়, এটা আমার ধারণা, বিশ্বাসও বলতে পার।'

'বিশ্বাস?' তপতী ওর চোখে চোখে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'এর জন্যে তোমাকে একদিন পস্তাতে হবে—এই বলে রাখছি।'

উদয়ন হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'একটু সহানুভূতি ও মানবিকতা না থাকলে আর এ লাইনে আসা কেন, তাহলে তো বাজারে মাংসের দোকান খুলে বসলেই হতো!'

তপতী আর কিছু বলেনি। মুখ ভার করে ও চলে গিয়েছিল।

যাক গে ওসব। এই তার মনের গড়ন, তার স্বভাব। ধীরে ধীরে এগুলো সে আয়ত্ত করেছে। আজ আর চট করে তা বদলে ফেলা যায় না।

আট নম্বরের পেসেণ্ট সত্যানন্দবাবুও ভীষণ ভয় পেয়েছিল। উদয়ন সর্বক্ষণ ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। হাসি হাসি মুখ করে সান্ত্বনা দিয়েছে, 'অত ভয়ের কিছু নেই, আমরা তো আছি, ভাল হয়ে যাবেন।'

সত্যানন্দবাবু ওর হাত জড়িয়ে ধরে অসহায় গলায় বলেছে, 'তুমি আমার ছেলের মতন, তুমি আমার কাছে থেকো।'

'থাকব, নিশ্চয়ই থাকব।'

একসময় ওর মনেও সে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। বিপদ তখন অনেকটা কেটে গেছে। রুগী এখন তার হাতের মধ্যে। আর কিছুদিন দেখে সে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তবু মানুষটা মারা গেল। তার সামনেই। সে পাগলের মতন ছোটাছুটি করেছে, চেঁচামেচি করেছে। কোন ফল হলো না। এর কোনো মার্জনা নেই যেন।

কিছুক্ষণ আগেই তো সে দেখে গিয়েছিল। কোনো গোলমাল নেই। হোস্টেলে এসে সবে জামা প্যাণ্টটা খুলে বসেছে। রুম-মেট অমিয়র সঙ্গে এখানকার সমস্যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। এমন সময়ই কলবুক এল। আট নম্বরের অবস্থা খারাপ। অবাক হলো উদয়ন। এই তো সে দেখে এসেছে! এরই মধ্যে আবার কি হলো! তাড়াতাড়ি করে ছুটল সে। এসে দেখে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে। বুকে নাকি অসহ্য যন্ত্রণা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে বেরিয়ে আসছে। কথা বলতে পারছে না। সারা মুখের ওপর কী গভীর আকুতি ফুটে রয়েছে। সে চিৎকার করতে লাগল, এ অবস্থায় কেন অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে না। সিস্টারকে ডাকল, এক্ষুণি অক্সিজেন সিলিণ্ডার। কোথায় সিলিণ্ডার! ওয়ার্ডে যা ছিল সবই তো রুগীদের দেওয়া হয়েছে। এখন স্টোরে আছে কিনা দেখতে হবে। ওয়ার্ড-বয় ছুটল। আধ ঘণ্টা হয়ে গেল ওর পাত্তা নেই। স্টোর-রুম বন্ধ। যার হাতে চাবির গোছা সে কোথায় যেন গেছে।

সত্যানন্দবাবুকে উদয়ন বাঁচাতে পারল না। অসহায়ের মতন চোখের সামনে এই মৃত্যুকে সে দেখল। ওর গোঙানিতে অন্য রুগীরাও কেমন ভয় পেয়েছে।

পার্টির কাছে খবর গেল। ছুটতে ছুটতে অনেক লোকজন চলে এল। এ যেন ওদের কাছে এক অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ। একজন এসে উদয়নের সামনাসামনি দাঁড়াল। উদয়ন তাকে চিনতে পেরেছে।

অসুখের সময় রোজই আসত। সত্যানন্দবাবুর বড় ছেলে। ওই ভিড়ের মধ্যেই হঠাৎ একজনের ওপর তার নজর পড়ল। বিরাট জুলফি, গোঁফঅলা এক ছোকরা তাকে একদৃষ্টে দেখছে। আগে কখনো দেখেছে বলে তার মনে হলো না। তাকানটা তার ভাল লাগল না।

সত্যানন্দবাবুর বড় ছেলে তার দিকে স্থির অথচ ছলছল চোখে চেয়ে কোনোরকমে জিজ্ঞেস করল, 'সাড়ে ছটার সময় আমরা এখান থেকে গেছি, কথা বলেছি, বেশ ভাল দেখে গেলাম; আর সাড়ে সাতটাতেই শেষ হয়ে গেল?' কথা বলতে ওর কষ্ট হচ্ছিল। তখনো ও তার দিকে চেয়ে আছে।

উদয়ন কেমন আমতা আমতা করে বিমর্ষ গলায় বলল, 'কেন হতে পারে না?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে ডাক্তারবাবু।'

উদয়ন হাসবার চেষ্টা করল একটু, 'তবে কি আমরা আপনার বাবাকে ইচ্ছে করে মেরে ফেলেছি?'

'তা বলছি না!' অস্ফুটে বলে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ছেলেটি। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।'

উদয়নের অস্বস্তি হচ্ছিল।

সেই জুলফিঅলা ছোকরা রাগে গর্ গর্ করে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারাই মেরেছেন।'

'তুই চুপ কর।'

'কেন চুপ করব শুনি, হাসপাতালে অনেক কিছুই হয়।'

উদয়নও এ অভিযোগ অস্বীকার করে না। সে ভাল করেই জানে, এখানে কি হয় আর না হয়। সে চুপ করেই থাকত। কিন্তু ছোকরার বলার ধরণ দেখে রাগ হলো তার। একটু বিরক্ত গলায় বলল, 'জেনেশুনে তবে আর দিলেন কেন?' তার বলার মধ্যে কোনো জোর ছিল না। কিছু না বললে ভাল দেখাত না, তাই বলা। না হলে ওরা আরো পেয়ে বসত। তাছাড়া, সে কি করে বলবে যে

আপনার বাবা এখানকার অব্যবস্থার জন্যে মারা গেছে। কি করে বলবে যে অক্সিজেন সিলিণ্ডারটা সময় মতন এলে আপনার বাবা মরত না। আমি মানি, সত্যানন্দবাবু আরো কিছুদিন বাঁচত। মরবার সময় খুব কষ্ট পেয়েছে। আমি আপনার বাবাকে বাঁচাবারই চেষ্টা করেছিলাম। এতে আমার কোনো দোষ নেই। আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আমার জোর নেই।

বড় ছেলে তখন হাউ হাউ করে কাঁদছে।

'ওরে শালা, আবার বুকনি।' বলেই সেই ছোকরাটা তার কাছে চলে এসেছে। উদয়নের কলার চেপে ধরেছে। মুখের ওপর আচমকা কটা ঘুষি মারল। চিৎকার চেঁচামেচি। সিস্টাররা ছোটাছুটি করল। হাউস-স্টাফরা দৌড়ে এল। ছোকরা তখন পালিয়েছে। উদয়নের কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে।

খবরটা সব ওয়ার্ডেই ছড়িয়ে পড়েছে। উদয়নকে পার্টির লোক এসে মেরে গেছে। সবাই স্তম্ভিত। শেষপর্যন্ত উদয়নই মার খেল? হাসপাতালে পেসেণ্ট ত মরবেই, তাই বলে পার্টি এসে হম্বিতম্বি মারধর করবে? এরকম চললে তাদের নিরাপত্তা কোথায়? উদয়নের ব্যাপারটায় সবাই ক্ষুব্ধ হলো। না, এখুনি এসব বন্ধ হওয়া উচিত।

তপতী এসে ওকে স্টিচ করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। সবাই জানে, উদয়নের ওপর তপতীরই অধিকার বেশী। পরে একগাল হেসে তপতী বলল, 'ওহে মানবপুত্তুর, এটা তোমার মানবতার পুরস্কার।'

'বিশ্বাস কর, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু মানুষটা আমার চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মরে গেল শুধু অক্সিজেনের অভাবে, এ দুঃখ সহজে যাবে না।'

'থাক, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ যেন এখানে এই প্রথম ঘটল।'

'তা হলেও খারাপ লাগে।'

'সেদিন তো ঠিক এমনি করেই বি-ব্লকের সাত নম্বর পেসেণ্টটা মরে গেল। ডিহাইড্রেটেড্ পেসেণ্ট, ফ্লুয়িড সেট দরকার। দেওয়া গেল না, ফুরিয়ে গেছে।'

'এগুলো তো আর ওরা জানে না।'

'জানার কথাও নয়।'

'দরকারের সময় পেথিডিন মরফিনও পাওয়া যায় না, আশ্চর্য!'

'তুমিই এখনও অবাক হও, আমরা আর হই না।' তপতী একটু হালকাভাবে হাসল।

'আসলে কেউ কারো জন্যে ভাবে না।' উদয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'যুগটাই পাল্টে গেছে দেখছ না, কেন ভাববে?'

'কেন কি, বাঁচতে হলে মানুষকে এ ভাবতেই হবে।'

তপতী ম্লানভাবে হাসল। খানিক পরে বলল, 'সেদিন আমার হাতেই একটা পেসেণ্ট মরল, আমি লোকটাকে চিনি। স্টেরিলিটির অভাবে টিটেনাস ফর্ম করে গেল। চেষ্টা করলাম বাঁচাতে, পারলাম না। লোকটার বউ ছেলেমেয়ে আছে; ওর অভাবে ওরা যে কোথায় ভেসে যাবে! হয়তো এতদিনে গেছেও। কিন্তু কে তার খবর রাখে বল!'

উদয়ন চুপ করে থাকল।

সুতরাং, এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। সবার মধ্যেই অসন্তোষ। আজ রাত হয়ে গেছে। কাল সকালেই সবাই জড়ো হয়ে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেবে। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে তারা এভাবে কাজ করবে না। যে অপরাধ তাদের নয়, তার জন্যে তারা কেন মার খাবে? অপমানিত হবে? হাউস-স্টাফ, ইনটার্ন, প্রয়োজন হলে সিস্টারদের নিয়ে এ মিটিং হবে। অনেক দিন ধরেই তারা স্বাস্থ্য-দপ্তরের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করেছে, কোনো প্রতিকার হয়নি। উদয়নকে মারার পর আর নীরব থাকা যায় না।

সে-রাত্রে উদয়ন আর ঘুমোতে পারেনি। অন্ধকারের মধ্যে ছটফট করেছে। তার অস্বস্তি বেড়েছে। কি করে ঘুমোবে?

সত্যানন্দবাবু তার হাত ধরে কত কাকুতি-মিনতি করেছে! দাপাতে দাপাতে চোখের সামনে লোকটা মরে গেল! বারবার সেই অসহায় মুখটাই মনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছে।

অমিয় বলেছে, 'ভেবে লাভ নেই, ঘুমিয়ে পড়।'

'ঘুমোতে পারছি না!' একটু সময় নীরব থেকে কি যেন ভাবল উদয়ন। পরে সামান্য অস্থিরভাবে বলল, 'জানিস অমিয়, ওর আত্মীয়-স্বজনরা কারণটা কোনোদিনই জানবে না।'

'এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার।'

সে-রাত্রে আবছা তন্দ্রার মধ্যে উদয়ন কেন যেন তার বাবার কথা ভেবেছে। তার বাবাও হাসপাতালে মারা গেছে। গ্যাস্ট্রিক আল্‌সার। অপারেশন করতে হয়েছিল। বাড়িতে আর ফিরে এল না তার বাবা। তখন ওর বয়েস আর কত! দশ কি বারো। আজো যেন সেদিনের কষ্টটা তার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে। কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না। ভোলা সম্ভব নয়। বুকের ভেতরটা খচখচ করতে থাকে। তার বাবাও কি সত্যানন্দবাবুর মতন এভাবে ডাক্তারবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিল, আমাকে বাঁচান ডাক্তারবাবু?

এক সময় অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হলো। উদয়নের সারা গায়ে যন্ত্রণা। চোখে-মুখে ঘুম না হওয়ার ক্লান্তি, অস্বস্তি। কলতলায় গিয়ে চোখে জল ছিটোলো। জ্বালা জ্বালা ভাব। আবার গতকালের কথা তার মনে পড়ল। কিছুতেই ঘটনাটা মন থেকে তাড়াতে পারছে না।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সবাই এসে জড়ো হলো গাইনি ওয়ার্ডের বড় ঘরটায়। এখানেই মিটিং। এভাবে আর কতদিন চলবে! আশু সুরাহার জন্য কিছু একটা তাদের করতেই হবে। সবার ভেতরেই এক ধরনের উত্তাপ ছড়িয়ে আছে। উদয়নকে মারার অর্থ ই হচ্ছে, তাদের সবারই নিরাপত্তার অভাব। এর মধ্যে কাজ করা যায় না। সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতেই হবে।

উদয়ন উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে হাসি মুখে বলল, 'শুধু আমাদের নিরাপত্তা নয়, রুগীদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। সবাই জানেন, এখানে বহুদিন ধরেই অনেক রকমের অন্যায় চলছে, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু—' উদয়ন তাকাল। সবার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর সহাস্য ভঙ্গিতে আবার বলল, 'তার আগে, একটা বিষয় আমাদের সবারই মনে রাখতে হবে, এখানে কোনোরকম রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে এলে চলবে না। শুধু মনে রাখতে হবে, আমাদের সামনে কতকগুলো মানবিক সমস্যা। মানবতার খাতিরেই এগুলোর সমাধানের আমরা চেষ্টা করছি মাত্র। আমরা মনে করি, রুগীদের জন্যে আমাদের অনেক কিছু করবার আছে।'

অমিয় দাঁড়িয়ে পড়েছে। চেঁচিয়ে বলল, 'উদয়ন খুব ভাল কথা বলেছ, আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলুন।'

সমর বলল, 'আমরা কি করতে চাই এটা আগে ঠিক হোক।'

'আমাদের অসুবিধের কথা স্বাস্থ্য-দপ্তরের কাছে অনেক দিন ধরে জানিয়েছি, কোনো ফল হয়নি। এবার আমাদের দাবিগুলো জানিয়ে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে অপেক্ষা করব, সময় পেরিয়ে গেলে ধর্মঘট।'

'খুব ভাল প্রস্তাব।'

'এখনও আপনারা একবার ভাবুন, কারো আপত্তি থাকলে বলুন।'

'না আপত্তি নেই।' সমস্বরে চিৎকার।'

'ধর্মঘটে তা হলে কারো আপত্তি নেই?'

'না নেই।' আবার সমবেত সমর্থন।

'একটা কথা মনে রাখবেন, এ ধর্মঘট কিন্তু আমাদের মাইনে বাড়াবার জন্যে নয়, রুগীদের স্বার্থে দলমত-নির্বিশেষে ডাক্তারদের ধর্মঘট।'

সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল। সকলের মধ্যেই দারুণ এক উত্তেজনা। সত্যই তো, এসব সমস্যা থাকলে কি আর ভালভাবে কাজ করা যায়!

অথচ সমস্যা কি আর এখানে একটা ? একটা নয়, বহু। যেমন, রুগীদের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ে অনেকদিন ধরেই এখানে কালোবাজারী চলছে, এগুলো আগে বন্ধ করতে হবে। জরুরী প্রয়োজনে স্টোর থেকে ওয়ার্ডে ওষুধপত্র পাঠাবার সব সময়ের জন্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার। খুব প্রয়োজনের সময়ও ফ্লুয়িড সেট, স্টিচিং সেট, পাওয়া যাবে না, অক্সিজেন সিলিণ্ডার থাকবে না, এসব কোনো কাজের কথা নয়। ফলে, তাদের সামনে যে এভাবে কত পেসেণ্ট মারা যাচ্ছে! এ চলতে দেওয়া যায় না। আউট-ডোরে রুগীদের ওপর আরো বেশী করে নজর দিতে হবে। প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়টিক ও অন্যান্য ওষুধপত্র যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, এমারজেন্সি, এক্স-রে এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে। এটা একটা ভেরী ইম্পরটেণ্ট ব্যাপার। এই তো সেদিন রাত দুটোয় একজনকে রক্ত দেওয়া গেল না। জেনারেল এমারজেন্সিতে ও. টি.-র ব্যবস্থা আরো ভাল করতে হবে। সার্জিকেল ডিপার্টমেণ্টের বিভিন্ন ওয়ার্ড বন্ধ, ওগুলো তাড়াতাড়ি খোলা চাই। পেডিয়াট্রিক সার্জারির অপারেশন থিয়েটার এবং সাইকিয়াট্রিক ইনডোর এখনও কেন খোলা হচ্ছে না ? এত বড় হাসপাতাল, সেখানে একটা মাত্র কেন্দ্রীয় স্টেরিলাইজেশনের ওপর আমাদের নির্ভর করে থাকতে হবে কেন ? তাতে অনেক অসুবিধে। সুতরাং, বিভিন্ন ও. টি.-তে বা ব্লকে স্টেরিলাইজেশন ব্যবস্থা বাড়াতে হবে। অনেক সময় তাড়াতাড়ি ইনভেস্টিগেশনের দরকার হয়, সে জন্যে প্যাথলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগগুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে। আধুনিকতম পরীক্ষাদির সুব্যবস্থা চাই।

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। যেমন অকেজো যন্ত্রপাতি সরিয়ে নতুন যন্ত্রপাতি কেনা, হাসপাতাল পরিষ্কার রাখা। হাউস-স্টাফ ও নার্সদের সংখ্যা বাড়ানো। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অনেক সময় কথাবার্তা শোনে না, তাদেরকে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করানো, ওষুধ, খাদ্য চুরি বন্ধ করা ইত্যাদি বহু রকমের ফর্দ।

একে একে সবাই এসব বিবিধ সমস্যার কথা বলে গেল। ঠিক হয়েছে, উদয়নই এই নবনির্মিত হাউস-স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক। এবার বেছে বেছে এক দুই করে ওরা এগুলোকে দাবির আকারে সাজিয়ে ফেলল। স্মারকলিপিতে নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখও করে দিল। ওই পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে। এখানেই ঠিক হলো, এর মধ্যে যদি কোনোরকম সুরাহা না হয়, তাহলে তারা তাদের সিদ্ধান্ত মতন কাজ করবে অর্থাৎ ধর্মঘট, ধর্মঘট বৃহত্তর স্বার্থে, নৈতিক প্রয়োজনে। সভা তুমুল হাততালির মধ্যে শেষ হলো।

এতে উদয়নের কাজ বেড়েছে। দুশ্চিন্তাও। এগুলো প্রথমে হাসপাতালে জানানো হলো। পরে এর প্রতিলিপি সে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্য-দপ্তর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন সংবাদপত্র একে একে সবাই তাদের কথা জানল।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাদের ডেকে পাঠালেন। উদয়নরা কয়েকজন গিয়ে দেখা করল। তিনি কিছুদিন সময় চাইলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন, এর মধ্যে তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। আপাতত আর ধর্মঘট নয়।

আবার মিটিং বসল। উদয়নের ওপরই ভার দেওয়া হলো, ও যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। তার যুক্তি হলো, মন্ত্রী যখন কিছুদিন সময় চেয়েছেন, তখন দেখা যাক না! তারা তো আর কোনো রাজনীতির দাবা খেলছে না। সুতরাং, আপাতত ধর্মঘট স্থগিত। কেউ কেউ তার এই মতে খুশি হলো না ; তাহলেও মেনে নিয়েছে।

পরে অমিয় বলেছে, 'কাজটা বোধ হয় ঠিক হলো না।'

'কেন?'

অমিয় হাসল একটু, বলল, 'লোহাটা গরম থাকতে থাকতেই ঘা দিতে হয়, একবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোনো লাভ নেই, তাতে শক্তিরই অপচয়।'

'দেখা যাক না।'

ইতিমধ্যে আরো অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। লালবাজার থেকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোক এসে খোঁজখবর নিয়েছে। বিশেষ

করে উদয়নের। দেখতে দেখতে সময় পেরিয়ে গেল। অথচ দু' একটা ছোটখাটো দাবি ছাড়া সবগুলোই প্রায় উপেক্ষিত। কয়েকবার স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর সঙ্গে এ নিয়ে তারা আলাপ-আলোচনা করেছে। তিনিও হাস-পাতালে এসে ঘুরে ঘুরে দেখে গেছেন। বন্ধুদের মধ্যে আগের উত্তেজনা অনেক কম। গোপনে গোপনে এরই মধ্যে কয়েকজন আবার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছে। উদয়ন সে খবরও জানে। এতে খানিকটা সে ক্ষুব্ধ।

তাছাড়া ওদের অনেকেরই ধারণা হয়েছে, এসব করে কোনো লাভ নেই। যা চলছে, চলুক না। কদিন পরে তো ওরা এখান থেকে চলেই যাচ্ছে। পুলিস-টুলিসের খাতায় নাম উঠবে, কি দরকার। ভবিষ্যতে চাকরি-বাকরির অসুবিধে হতে পারে। তার ওপর এসব করলে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে বলতে পারে! শেষে ডিপ্লোমাটাই যদি কেড়ে নেয়? অনেকের মধ্যেই কেমন যেন একটা ভয় ঢুকে গেল। উদয়ন একটু অবাক হলো। অনেকেই আর তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। তাছাড়া, ডিপ্লোমা নিয়ে নেবে এটা ওরা ভাবল কি করে?

আসলে, মন্ত্রীমশায় আলোচনার শেষে হাসতে হাসতে কথাটা তো ওকেই বলেছিলেন। ওরা তখন উঠে পড়েছে। তিনি উদয়নের দিকে চেয়ে চেয়ে বলেছিলেন, 'আপনি এসব নিয়ে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? শেষে কিন্তু আপনার ডিপ্লোমাটা আমরা নিয়ে নেবো।'

উদয়ন এটাকে নিছক ঠাট্টা হিসেবেই ধরেছে। সেও হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিল, 'আপত্তি নেই। তবে তার আগে এগুলো পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে হবে।'

এই কথাটাই এখানে অন্যভাবে রটে গেছে।

এর মধ্যে কয়েকটা বড় রাজনৈতিক দলের লোকও এসে তার সঙ্গে দেখা করেছে। উদয়নকে তারা সেই দলে টানতে চেয়েছে। সে রাজী হয়নি। কি করে হবে, একজনকে সমর্থন করা মানে তো,

অন্যজনের রোষদৃষ্টিতে পড়া। বেশ তো, কাজটা যদি ভাল হয়, তাহলে সবাই আসুন না। এ তো আমাদের জন্যেই আমাদের কিছু করা। কিন্তু সেখানে কোনো সায় নেই। উদয়ন টেরও পেল না, ইতিমধ্যে কখন রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে গেছে।

এভাবে অস্বস্তি তার বাড়ছেই। অনেকেই যেন তাকে এড়িয়ে চলছে। কিন্তু কেন? সে বুঝতে পারছে না কিছু। তাড়াতাড়ি একটা কিছু হওয়া দরকার।

আবার মিটিং বসল। সেই গাইনি ওয়ার্ডে। এবার অন্য চেহারা। দেখা গেল দুটো-তিনটে দল। কেউ কেউ ধর্মঘটের পক্ষে, আবার বিপক্ষেও অনেকে। তবে শেষপর্যন্ত ধর্মঘট যদি হয়ই তাহলে তারাও কাজ করবে না। কেউ কেউ আবার সরাসরি এর বিরোধিতা করবে বলে হুমকি দিল। প্রথমে কথা কাটাকাটি, পরে হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। সুতরাং, ধর্মঘট আর হবে না, মিটিং শেষ।

সবাই চলে গেলে একসময় উদয়নও বাইরে বেরিয়ে এল। তার বুকের ভেতরটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ঘুরছে, পা আর চলে না। অমিয়র কথাই ঠিক হলো, সে ভুল করেছে। সত্যিই কি ভুল? সে তো কোনো রাজনীতির জুয়া খেলতে চায়নি। সহজ সরল-ভাবে যা বিশ্বাস করত, তাই করেছে। এতে তার স্বার্থ কতটুকু?

পথে অমিয়র সঙ্গে দেখা। উদয়ন একবার দাঁড়াল।

অমিয় দুঃখ করে বলল, 'এভাবে হয় না।'

'তাই দেখছি।' উদয়নের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল।

'তখনই আমাদের ভুল হয়েছে, কোনো একটা রাজনৈতিক দলের সমর্থন দরকার ছিল।' অমিয়কে এখন অনেক স্পষ্ট মনে হলো। এতে সেও কম আঘাত পায়নি। আসলে, এটাও মন্ত্রীমশায়ের এক চালাকি। উদয়ন বুঝতে পারেনি। ওরা ধূর্ত কি আর কিছু কম! নানারকম লোভ দেখিয়ে আমাদের অনেককেই ওরা বশ করে নিয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহত গলায় ও বলল, 'একা একা কিছু করার দিন বোধহয় একেবারেই চলে গেছে।'

উদয়ন কোনো কথা বলল না। কথা বলতে ইচ্ছে হলো না তার। তারাও তো এ নিয়ে একটা কথা বলতে পারত, কই, কেউ তো কিছু বলল না এ নিয়ে! সেও তো চেয়েছিল, সবাই এগিয়ে আসুক। কেউ এল না। এতে কি তার কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হতো? সবারই তো এটা ভাবা উচিত ছিল। এখানে সবাইকেই তো আসতে হয়। মুমূর্ষু মানুষের কি কোনো জাত আছে? তখনো কি দলের ভাবনা বড় হয়ে দেখা দেয়? এই কথা ভেবেই সে কারো কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করতে পারেনি। শুধু দল নয়, দলের কথা নয়, আরো কিছু চাই, বুক জোড়া ভালবাসা। চাই অকপট বিবেক। এতে তার কি লাভ? মানুষই মানুষের জন্যে ভাবে। সেও তাই ভেবেছিল। চোখের সামনে অমনভাবে লোকটা মরে গেল! বুকের ভেতরটা যেন আবার খচ্ করে ওঠে। হঠাৎ সত্যানন্দবাবুর কথা ভাবতে গিয়ে তার বাবার মুখটা ভেসে উঠল।

অসহায় করুণ দুঃখী মানুষগুলো দিনের পর দিন তার বুকের মধ্যে দুঃখ ছড়িয়েছে। তাই এসব ভাবা। এর বেশী কিছু নয়। লাঞ্ছিত মানবতা তাকে প্রতি মুহূর্তে আহত করেছে। দলাদলি নীচতা স্বার্থপর জগত আছে। থাকবেও। কিন্তু তার থেকে কি মানুষ বেরিয়ে আসবে না? তার কেন যেন মনে হয়, আজ হোক, কাল হোক, মানুষকে তার মত করে একদিন ভাবতে হবে। ভালবাসাটা শুধু মুখে নয়, মানুষকে বুকের মধ্যে সযত্নে লালন করতে হবে। এসব ভাবতে গিয়ে চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে তার। বুকের ভেতরটা দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠল। আর দাঁড়াল না উদয়ন। আস্তে আস্তে মাঠের এক পাশে এসে বসল।

এখানে আবছা অন্ধকার।

ওদিক থেকে কাদের কান্না যেন ভেসে আসছে। কোনো প্রিয়জন হয়তো মারা গেছে। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল উদয়ন। হঠাৎ মনে হলো, কে যেন তার পাশে এসে বসেছে। তাকিয়ে দেখে, তপতী।

মায়ার হরিণ

আমার নাম কমল। আর অমল যথার্থ অর্থেই আমার বন্ধু। আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। আমরা এক স্কুলে এক ক্লাসে, এমন কি এক কলেজেও পড়াশুনো করেছি। অনেকদিন আমরা এক পাড়াতেও ছিলাম। একদিন ওরা সিঁথির দিকে উঠে গেল। তাহলেও একটা সময় নিয়মিতই আমাদের দেখা হয়েছে। আজকাল আর তা হয় না।

অনার্স নিয়ে ও বি.এস-সি. পাস করল। আমি বি. কম.। সেবার কি করে যেন ওর কাছে ডাক্তারী পড়বার একটা সুযোগ এল। তুম করে ও ভর্তি হয়ে গেল। আমি এম. কম.-এ ভর্তি হলাম। অমলের ব্যাপারে আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। তার কারণও ছিল। আমি ওদের অনেকদিন ধরেই চিনি। ওদের সাংসারিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ওর বাবা সামান্য ক' টাকার একটা চাকরি করেন। ওরা ভাইবোন মিলে ছ'জন। ডাক্তারী পড়া কি চাট্টিখানি কথা! সব দিক ভেবে চিন্তে এগুতে হয়। সব জেনেশুনেও অমল কি করে এই ঝুঁকি নিল, ভেবে পেলাম না। ওর কাছে এটা নাকি একটা চ্যালেঞ্জ। ওর কথা হলো, মনের জোর থাকলে নাকি সবই হয়। এসব বাধা-বিপত্তি তখন কিছুই নয়। ওকে বোঝানো বৃথা। ও একবার মনে মনে যা ঠিক করেছে, তার থেকে ওকে সরান যাবে না। ওকে কি করে বোঝাব যে মনের জোরেই সব হয় না। আমি ভাল করেই জানি, ও খুব সহজে, সুবোধ বালকের মতন আমার কথা মেনে নেবে না। এই জেদটাই ওর স্বভাবের একটা বড় অহঙ্কার। কষ্ট করবে, তবু হার মানবে না।

আমি এখন এম. কম. পাস করে কলকাতার এক কলেজে কাজ করছি। অমল তখনো পড়ছে। এর মধ্যে ও কোথায় একটা

পার্ট-টাইম শিক্ষকতা জুটিয়ে নিয়েছে। দু' একটা ছাত্র-টাত্রও পড়ায়। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কমতে শুরু করেছিল। ও-ও এখন আর আমার কাছে ঘন ঘন আসতে পারে না। আমিও যেতে পারি না। তবু, আমাদের অন্তরঙ্গ একটা সম্পর্ক আছে।

আজকাল অনেক বিষয়েই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। দেখা হলেই তর্কাতর্কি হয়। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অমলের সঙ্গে আমার এরকম ছোট ছোট অনেক ফাঁক তৈরী হচ্ছিল। ওর চোখে-মুখে, কথায় এখনো যেন স্বপ্নের ঘোর, নেশা ; কৈশোরের স্বপ্নালু দিন-গুলোকে যেন আজো ও ভুলতে পারেনি। আমি কিন্তু ইদানীং, ওর মতন করে আর স্বপ্ন দেখি না। তার কারণও আছে। আমি বিয়ে করেছি। বর্তমানে আমি দুটি পুত্রের জনক। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব আরো বেড়েছে। আমি ক্রমশই সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে পড়ছিলাম। সুতরাং, আমি আর ওর মতন স্বপ্ন-টপ্ন দেখতে পারি না। এজন্যে আমার কোনো খেদ বা ক্ষোভ নেই।

আমি সহজেই সব মেনে নিচ্ছিলাম। জীবন তো এরকমই। আমার খেয়াল-খুশির ওপর এর গতি নির্ভর করে না। যখন যেদিকে খুশি বাঁক নেয়। সেখানে কত রকমের সব চোরা ঢেউ, ঘোলা জল, আবর্ত। এসব ক্ষেত্রে স্রোতের অনুকূলে চলা ছাড়া আমার আর উপায় কি! বিপরীতে যাওয়ার সাধ্য আমার নেই। একেই বলে অ্যাড্‌জাস্টমেণ্ট। আমি এভাবেই সব মানিয়ে চলি। সব সময় যে তা আমার মনের মতন হয়, তা নয়। বেঁচে থাকার মতন কতকগুলো কলাকৌশল আমি ইতিমধ্যেই রপ্ত করে নিয়েছি। কিন্তু অমলের বেলায় একটু অন্যরকম। ও যা পছন্দ করে না, সহজে তার সঙ্গে কোনোরকম আপস নয়। অসম্ভব ওর মনের জোর আর সাহস।

এর মধ্যে ও একদিন আমার এখানে এল। অনেক কথা হলো। এক সময় ও বলল, 'আমাদের এই চলবার পথে নিশ্চয়ই একটা আদর্শ থাকা চাই। তা না হলে এ জীবনের অর্থ কি, কেনই বা এই মনুষ্য জীবন, আর কেনই বা এই বেঁচে থাকা?'

এসব কথা ওর মুখে বহুবার আমি শুনেছি। ওর মুখে বেশ মানায় কথাগুলো! আমার কাছে এগুলো নিছক শব্দের একটা খেলা মনে হয়। আমার হাসি পায়। ওকে হঠাৎ যেন আমার ভীষণ ছেলেমানুষ মনে হয়। আমার ঠোঁটের কোণায় পাতলা একটু হাসি। ওর চোখে চোখে চেয়ে বললাম, 'আদর্শ কি শুধু কতকগুলো ভাল ভাল কথার রংচঙে বাহারী একটা মাদুলী যে ওটাকে গলায় ঝুলিয়ে চলতে হবে?'

অমল ঠিক খুশি হলো না আমার কথায়। একটু অবাক হলো। আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। পরে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে সামান্য গম্ভীর অথচ আহত গলায় বলল, 'তা কেন, এটা হলো এমন কতগুলো বিশ্বাস, আর মূল্যবোধ, যেগুলো ছাড়া আমরা সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি না, বাঁচা যায় না।'

আমি এবার জোরে জোরে হাসলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিলাম না। কি ভেবে আস্তে আস্তে আমি বাইরের দিক একবার তাকালাম। আমার এই ঘর থেকে বাইরের রাস্তা, রাস্তার আশ-পাশের দোকান, ট্রামলাইন, গাড়ি-ঘোড়া, বড় বড় বিজ্ঞাপন, ব্যস্ত মানুষের ছোটাছুটি, সব দেখা যায়। কয়েকটা বড় বড় জরুল গাছও চোখে পড়ে। থোকা থোকা ফুল ফুটেছে এখন। টিং টিং করতে করতে ট্রাম চলে যাচ্ছে। গোঁ গোঁ শব্দ আর ধোঁয়া ছড়িয়ে বাস ছুটছে। টুং টাং রিকশা চলছে। ট্যাকসি, প্রাইভেট কার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই উধাও। মোড়ের ওষুধের দোকানটায় লোকের ভিড়। পাঁচমিশেলি শব্দের গুঞ্জন। জরুল গাছের তলায় কটা ভিখিরি পরিবার। এখানেই ওরা যেন ঘর বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। আমি প্রায়ই এসব ছবি দেখি। মেয়েগুলো রান্না করে মাটির সানকিতে খেতে দেয়, খায়। ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি বদলায়। ছানাপোনাগুলো আশপাশেই ঘুর ঘুর করে। ওরাও তো বেঁচে আছে। দৃষ্টিটা এক সময় সরিয়ে আনি। অমলের মুখের দিকে চাইতে চাইতে বললাম, 'দেখ, বাঁচার অর্থ টা তো আর সবার কাছে

সমান নয়। আমি তো দেখছি এগুলো ছাড়াই মানুষ দিব্যি বাঁচছে।' আমার ঠোঁটে তেরছা একটুকরো হাসি ফুটে আবার মিলিয়ে গেল।

অমল ছোট করে একটা নিশ্বাস ফেলল। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল একটু সময়। মনে হলো, আমার চোখে ও যেন কিছু একটা খুঁজছে। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'তুই ভুল করছিস কমল, বাঁচা আর টিঁকে থাকা এক জিনিস নয়। আমি একজন সত্যিকারের সৎ, বিবেকবান মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার যে মূলধন, সেই মূলধনের কথা বলছি।'

আমি এবারও হেসে ফেলেছি। একটা ঢোক গিলে বললাম, 'তোর এই মূলধনেও আজকাল ঘুণ ধরেছে রে। সৎ হতে চাইলেই আজ আর চট করে সৎ হওয়া যায় না। তার জন্যে পারিপার্শ্বিক আরো কতকগুলো সর্ত থাকা চাই। সেগুলো না থাকলে তো আর বিবেকবান হওয়া যায় না বন্ধু!' আমার গলায় বুঝি সামান্য পরিহাস ছিল।

অমল গম্ভীর হলো, বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বোধটাও এক্ষেত্রে অনেকখানি। ভুললে চলবে না, এখানে আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেরও একটা মস্তবড় ভূমিকা আছে।' অমল অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল। ক' মুহূর্ত চুপচাপ কি যেন ভাবল। পরে আবার বলল, 'পারিপার্শ্বিক তো আর আমাদের বাদ দিয়ে নয়, আমাদের নিয়েই।'

আমি চুপ করে থাকলাম অনেকক্ষণ। ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার এই ঘরে বাড়তি কোনো আসবাবপত্তর নেই। একটা টেবিল, স্টীলের ক'টা চেয়ার। একদিকে সোফাসেট। একটা কাঠের বুককেস। সেখানে কিছু গ্রন্থাবলী সাজানো। অন্য তাকগুলোয় নানাধরনের পুতুল। দেয়ালে একটামাত্র ফটো। ফটোটা বিদ্যাসাগরের। পুরনো হয়ে গেছে। ক্রমশই যেন আবছা হয়ে আসছে। আমার টেবিলের ঠিক ওপরই সাহেব কোম্পানীর দামী

একটা ক্যালেণ্ডার। বিখ্যাত কয়েকজন আর্টিস্টের আঁকা কতকগুলো ছবি। টেবিলের ওপর সিগারেটের প্যাকেট, কারু কাজ করা মাটির একটা অ্যাস-ট্রে। আমি আড়চোখে অমলকে আর একবার দেখে নিলাম। আমার কেন যেন মনে হল, ও এখনো বেশ অনায়াসেই এসব কথা ভাবতে পারে? ওর বলার মধ্যেও একটা আন্তরিকতা, উত্তাপ আছে। ও কি চোখে কিছু দেখতে পায় না? আমি ছোট করে কাশলাম কয়েকবার। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, 'এগুলো শুধু কথার কথা।'

'কথার কথা?' অমল যেন খুব আহত হলো। ও আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকল অল্পক্ষণ। ওর মুখের ওপর মলিন এক ছায়া তির তির করছে। কেমন যেন একটু অসহায়, বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম। হাল্কা গলায় বললাম, 'তাছাড়া কি? মানুষ আসলে আরাম চায়, ভাল খেতে ভাল পরতে চায়।' কথা বলতে বলতে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

অমল বলল, 'ঠিকই, কিন্তু একটা সময় বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলে। তাছাড়া মানুষের চাওয়ার কি শেষ আছে?'

আমি মুখ ভরতি সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে ছোট ছোট বৃত্ত তৈরীর খেলা খেলছিলাম। মুচকি হেসে বললাম, 'তাতে দোষ তো নেই!'

অমল এবার বিদ্যাসাগরের ছবিটার দিকে তাকাল। ওর মুখের ওপর থেকে এই মুহূর্তে বিমর্ষ ছায়াটা যেন অনেকখানি সরে গেল। গলায় সামান্য জোর দিয়ে ও বলল, 'দোষ আছে বৈকি! যে জিনিস চাইতে বা পেতে গিয়ে আমাকে আরো বড় রকমের অন্যায় করতে হয়, আরো স্বার্থপর, নিষ্ঠুর হতে হয়, সেখানে এধরনের লোভকে আমল দেওয়া নিশ্চয়ই দোষের।' ওর গলায় গভীর এক আবেগ ও উত্তাপ ছিল।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে বললাম, 'আমি তো দেখছি তার উল্টোটাই আজ সব চাইতে সত্যি।'

অমল কি ভেবে ম্লান একটু হাসল। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল একটু সময়। অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবল। ওর মুখের ওপর আবার সেই উদাসী ছায়া। বুকের গভীরে ওর কোথায় যেন একটা দুঃখ আছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ওর চোখমুখ কেমন দীপ্ত হয়ে উঠল। ও আমার মুখের দিকে তাকাল। পরে শান্ত, ভরাট গলায় বলল, 'আমার কি মনে হয় জানিস, সোনার একটা মায়া হরিণ আমাদের চোখের সামনে দিনরাত ঘোরাঘুরি করছে। আমাদের সামনে কত রকমের সব ভোজবাজির খেলা দেখাচ্ছে ওটা। সেই খেলা দেখতে দেখতে কখন একসময় আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা আমাদের ঘরের কথা ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম, আমাদের ঘরে এর চেয়েও বড় ঐশ্বর্য, সম্পদ রয়েছে। ওই নকল হরিণটা আমাদের কেবলই ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর থেকে বের করে আনছে। ওর পেছনেই আমরা ছুটতে লাগলাম। এভাবেই ছুটতে ছুটতে আমরা ক্রমশ ভিখিরি হয়ে পড়ছি। ক্লান্ত। ঘরের পথ আমরা হারিয়ে ফেলছি। ওটা আমাদের আর কোথায় নিয়ে যেতে চায় বলতে পারিস?' অমল আমার চোখে চোখে চেয়ে থাকে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে ওর।

ওর কথা শুনে আমারও চমক ভাঙল। আমি চুপ করে থাকলাম। আস্তে আস্তে সিগারেট টানলাম। কথাটা বেশ বলেছে অমল! কেন জানি, আমার মনে হলো, আজকাল আমার চোখের সামনেও সেই মায়া হরিণটা তার রকমারি খেলা দেখাচ্ছে।

অমল এবার হাসল সামান্য। বলল, 'বুঝলি তো, আসলে আমাদের সামনে পজেটিভ কিছু একটা থাকা চাই। আমার কি করা উচিত আর উচিত নয়, এ বোধটা গোড়াতেই তৈরী হয়ে যাওয়ার দরকার।' ওর কণ্ঠস্বরে গভীর এক আবেগ ও উষ্ণতা ছিল।

ওর কথা শুনে আমি মনে মনে হাসলাম। আমার চোখের তলায় বোধ করি সামান্য উপহাস, উপেক্ষা ফুটে উঠল। ও বোধ হয় তাও

টের পেল না। আমি হাল্কা গলায় বললাম, 'তোর মতন করে ক'জন আর ভাবে বল!'

অমল প্রতিবাদ করল, 'অনেকেই ভাবে, না ভাবলে চলবে কেন! নতুবা দয়া মমতা বিবেক মনুষ্যত্ব এসবই যে মিথ্যে হয়ে যাবে!' ওর গলায় কোনোরকম জড়তা, সংশয় নেই। ও এগুলো আজো বিশ্বাস করে। আজো এসব নিয়ে ও মাথা ঘামায়।

আমি এবার জোরে হেসে উঠলাম। সিগারেটের টুকরোটায় শেষ টান মেরে অ্যাস-ট্রের গায়ে ঘষে ঘষে নিবিয়ে দিলাম। বাইরের দিকে তাকালাম। কোকাকোলার একটা ঢাউস বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। সেই বিজ্ঞাপনের তলায় কতকগুলো ভিখিরির বাচ্চা লাফালাফি করছে। দৃষ্টিটা একসময় সরিয়ে আনি। অমলের চোখে চোখে চেয়ে বললাম, 'বিবেক মনুষ্যত্বের আজকাল যা হাল হয়েছে!' আমার বলার মধ্যে সামান্য ঠাট্টা, কৌতুক ছিল।

অমল বিস্মিত, বিমূঢ়। আমাকে অপলকে দেখল খানিকক্ষণ। তারপর বিড় বিড় করে বলল, 'এগুলো বাদ দিলে তো আর কিছু থাকে না রে!' ও যেন কেমন ম্রিয়মান। মুখের ওপর বিষাদের আবছা ছায়া। একধরনের অস্বস্তি। সামান্য অন্যমনস্ক।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। কোনো লাভ নেই। কেননা, আমি এটা ভাল করেই জানি, ওর বিশ্বাস থেকে একচুলও ওকে সরান যাবে না। আমার কথাও বুঝবে না। আমি যদি বলি, এগুলো বাদ দিয়েও মানুষ আজ দিব্বি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, কোনো অসুবিধে হয় না তার, জীবনের কাছে বড় বড় কথার কোনো দাম নেই, ওগুলো নিছক শব্দমাত্র, আর ওই শব্দগুলো অনেকদিন ধরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এখন স্রেফ অর্থহীন হয়ে ভারী পাথর-টাথরের মতন পথের দুপাশে পড়ে আছে—তাহলেও বোধ করি, ওর এই ঘোর কাটবে না।

এভাবেই আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। তাহলেও আমাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। আজো ওর কোনো বিপদ-আপদের কথা শুনলে আমি অস্থিরতা, অস্বস্তি বোধ

করি। আমার মনের তলায় ওর জন্যে এখনো একধরনের দুর্বলতা আছে। ও-ও আমাকে ভুলে থাকতে পারে না।

এই তো কদিন আগে ওর ভাই গৌতম আমার কাছে ছুটে এল। ভীষণ নাকি গণ্ডগোল, পাড়ার কতকগুলো বদ, উঠতি মস্তান অমলকে মারবার জন্য বাড়ি চড়াও হয়েছে। অমলও ভয় পাওয়ার ছেলে নয়, ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের মোকাবিলা করতে চাইছে। ওর মা-বোনেরা ঘরের মধ্যে ওকে আটকে রেখেছে। ওর মা তো ভয়েই কাঠ। বোন-গুলো কান্নাকাটি করছে। দূরে দাঁড়িয়ে নাকি অনেকেই মজা দেখছে। কেউ আর সামনে গিয়ে এর প্রতিবাদ করছে না। এক নিশ্বাসে গৌতম কথাগুলো বলে গেল। ওর গলা কাঁপছিল। ও-ও ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ওর চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত। গলা শুকিয়ে গেছে। চোখের রঙ ফ্যাকাসে। সারা মুখ-চোখে আতঙ্ক। ওরা বুঝি তার দাদাকে মেরেই ফেলবে। ওরা সব পারে। চোখের সামনে তার দাদাকে মেরে ফেললেও কেউ এগিয়ে আসবে না। গৌতমের চোখে জল এসে গিয়েছিল। সব কথা ও বলতেও পারল না। বুকের ভেতরটা যেন কিরকম করছিল। মাথা ঝিম ঝিম করছিল।

আমারও মনে হলো, এসব বদ ছেলেদের বিশ্বাস নেই। হয়তো কিছু একটা করে বসবে। অমলকে তো আমি চিনি। আমারও কেমন ভয় করতে লাগল। এক্ষুণি কিছু একটা করা দরকার! আমিও ছটফট করছিলাম। কি যে করি, বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ গোপালের বাবার কথা আমার মনে পড়ে গেল। গোপাল আমার বন্ধু। অমলকেও ও চেনে। ওদের বাড়িতে আমি অনেকবারই গিয়েছি। ওর বাবা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমি কাকাবাবু বলি। অমলরা এখন যেখানে আছে, কাকাবাবু সেই থানারই ও. সি.। আমি তাড়াতাড়ি করে গৌতমকে নিয়ে সোজা থানায় চলে এলাম। আমাকে দেখে কাকাবাবু একটু অবাক হলেন, বললেন, 'তুমি, কি ব্যাপার?'

'ভীষণ দরকার কাকাবাবু।' আমি কথার মুখটা ধরিয়ে দিলাম।

আমারও গলা কাঁপছিল। অস্বস্তি বোধ করছিলাম। গৌতম এক নিশ্বাসে বাকিটা বলে গেল।

সব শুনে কাকাবাবু বললেন, 'ওদের সঙ্গে আবার লাগতে গেল কেন তোমার বন্ধু! ওরা হলো অ্যান্টিসোস্যাল, ক্রিমিনাল, মান-ইজ্জতের বালাই নেই। ঠিক আছে, তোমরা যাও। এক্ষুণি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আমরা এসে দেখি কোনো হামলা নেই। সব সরে পড়েছে। আমি তখনো পর্যন্ত আসল ব্যাপারটা কি, জানি না। হঠাৎ অমলের ওপর এ ধরনের আক্রমণের কারণটা আমার কাছে অস্পষ্ট। বাড়ির সবাই খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে আমাকে দেখে। কান্না বন্ধ করেছে। আমি অমলের কাছে গেলাম। ও চুপচাপ। গুম মেরে বসে আছে। ওর চোখেমুখে তখনো রাগ, উত্তেজনা। এক অক্ষম আক্রোশে ফোঁস ফোঁস করছে।

আমি হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো রে, শেষে তোর ওপর ওদের এমন সুনজর?'

ও ফোঁস করে উঠল, 'ওই স্কাউণ্ড্রেলগুলোর সঙ্গে আমার একদিন একটা রক্তারক্তি হবে।'

আমি গম্ভীর হয়ে বলেছি, 'বলিস কি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।'

'জানিস তো, ওরা যখন তখন যাকে তাকে খুন করে ফেলতে পারে?'

'তাহলে আর কি, ওরা যা খুশি তাই করবে আর আমাদের তা হজম করতে হবে!'

'সবাই তো তাই করছে রে!' আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ফের বলেছি, 'যাকগে, ব্যাপারটা কি বল তো।'

অমল একটু সময় চুপ করে থাকে। পরে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে গেল। রোজই সকালে ওর বোন লতু স্কুলে যায়। কিছুদিন ধরেই কতকগুলো ছেলে ওর পেছন পেছন যাচ্ছে। যেতে যেতে ওরা

হাসিহাসি করে। নোংরা কথাবার্তা বলে। নানা রকমের ইঙ্গিতও মন্তব্য করে। ফেরার সময়ও ওই ছেলেগুলো থাকে। একই ধরনের আচার-আচরণ। দিনদিনই ওদের দুঃসাহস বাড়ছিল। ওই ছেলেগুলোকে অমলও চেনে। এ-পাড়ারই ছেলে। গলির মুখটায় দিন-রাত আড্ডা মারে। সিগারেট ফোঁকে, গাঁজা টানে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খিস্তি মারে। সিনেমার হাল্কা চটুল গান গায়। কোনো রকমের লাজ-শরমের বালাই নেই। অমলও যেতে আসতে ওদের বেলেল্লাপনা দেখেছে। আজ যেন ওরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। ইয়ার্কি মারতে মারতে লতুর গায়ের ওপর এসে পড়ছিল। বাড়ি ফিরে লতু কেঁদে ফেলেছিল। অমল তখন বাড়িতেই। ওর মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে ও বেরিয়ে গেল। একটা ছেলে তখন শিস দিতে দিতে এদিকেই ফিরছিল। ধরে আর কথা নেই। দুমদাম করে কটা চড় চাপড় মারল। কিছু পরেই ওরা দলবল নিয়ে এর বাদলা নিতে এল।

সব কথা শোনার পর অমলকে বললাম, 'তুই হঠাৎ চড়টা মারতে গেলি কেন?'

'মারব না, ইতর বদমায়েসের দল, ভেবেছেটা কি!'

'কাজটা ভাল করিস নি।'

'কেন?' ওর চোখদুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। চোখেমুখে উত্তেজনা।

আমি ওর মুখের দিকে অল্পক্ষণ চেয়ে থাকলাম। পরে আস্তে আস্তে বললাম, 'ওদের সঙ্গে তুই একলা কি করবি? ওরা তো ছুরি বোমা, পিস্তল-টিস্তল নিয়ে এসেছিল। তোকে এখানে মেরে ফেললেও, কেউ কিন্তু কিছু বলতে আসত না।'

'তাই বলে এর পরও কিছু বলব না?'

আমি বললাম, 'ধমক-ধামক দিলেই হতো। দেখছিস তো ওদের কি রকম খাতির-টাতির! কি দরকার এসব ফালতু ঝক্কি-ঝামেলায়!'

'নিজের বোনের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করবে আর ভয়ে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকব! বেশ বলেছিস ভাই! এর চেয়ে মরে যাওয়াও ঢের ঢের ভাল।'

আমার রাগ হলো ওর ওপর। ও কি রাস্তাঘাটে চোখ বুজে চলে? কিছুই কি দেখতে পায় না! না, কানে আসে না? একটু অসহিষ্ণু, ঠাট্টার গলায় বললাম, 'বোকার মতন কথা বলিস না তো। মরে গেলেই ভাবছিস এর সুরাহা হয়ে যাবে? মাঝে মাঝে কাগজ-টাগজে তো দেখিস, বেশী সাহস দেখাতে গেলে দশাটা কি হয়?'

অমল সামান্য ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'অনেকে মিলে এর মোকাবিলা করলে তো আর এমন হতো না!'

আমি উপহাসের হাসি হাসলাম, 'সবাই কেমন মোকাবিলা করল দেখলি না, কেউ এল তোর হয়ে? আসলে সবাই সেয়ানা। আগ বাড়িয়ে কে কার বিপদ ডেকে আনতে চায় বল!'

অমল আমাকে দেখল এক পলক। বলল, 'এতে কি শেষপর্যন্ত আর বিপদ ঠেকানো যায়?'

আমি মুচকি হাসলাম, 'তখন বুদ্ধি খরচ করে সামলাতে হয়। এই হলো আজকের দিনের হাওয়া। বুদ্ধিমানেরা সেই হাওয়ার সঙ্গেই তাল রেখে পা ফেলে।'

অমল তখনো সহজ হতে পারেনি। সামান্য ক্ষোভ ও বিরক্তি নিয়ে ও বলল, 'এ রকম বুদ্ধিমান হয়ে আমার কাজ নেই।' খুব অস্বস্তি হচ্ছিল ওর।

আমি চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। একটা সিগারেট ধরালাম। সিগারেটটা টানতে টানতে ওকে এবার একটু শক্ত গলায় বললাম, 'বুঝলি তো, শুধু কথায় মানুষের চরিত্তির শুদ্ধ হয় না। আজ পর্যন্ত তো এখানে কত সাধু-সন্ত মহাপুরুষের জন্ম হলো, কত তাঁদের বাণী, উপদেশ, ভাল ভাল সব কথা, কি হয়েছে এতে? মানুষ কি আজো তার পুরনো দিনের সব নোংরামো ভুলতে পেরেছে? তাছাড়া এতে

কি মানুষের দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার আদৌ কোনো উপশম হয়েছে? আসল প্রশ্নটা কিন্তু আমার ধারণা, আরো গভীরে।'

অমল আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। কিছু বলল না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দিন দিনই সমাজের চেহারাটা কি রকম ঘোলা, জটিল হয়ে উঠছে। নোংরামো বাড়ছে। এগুলোর সঙ্গে নিজেকে সে খাপ খাওয়াতে পারে না। তার কষ্ট হয়। অমল যেন চোখের সামনে দেখতে পায়, মানুষ শুধু উন্মত্তের মতন ছুটে চলেছে। কোনো দিকে হুঁশ নেই তার। দেখতে দেখতে আবহাওয়াটা যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ভেতর থেকে দয়া-মায়া কমে যাচ্ছে। কোনো আদর্শ, বিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে না বেশীদিন। শ্রদ্ধা নেই। শুধু এক অস্থিরতা, চালাকি। এই চলার শেষ কোথায়? শুধু ভাসছে আর ভাসছে। কৃত্রিমতা নিয়ে মানুষ কি দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে? হায় রে! ওই ইতর, লুম্পেন ছেলেগুলোর সঙ্গেও এখন থেকে বুদ্ধি খরচ করে চলতে হবে! খুনী হওয়াটাই কি আজকে মনুষ্যত্বের বড় প্রমাণ? অমল ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। বুকের ভেতরে তার গভীর যন্ত্রণা।

আমি সিগারেটটা শেষ করে এক সময় উঠে পড়েছি। ওর মার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথাটথা বলে চলে এলাম।

অস্বীকার করব না, আমার প্রয়োজনেও অমল ছুটে আসে। অবশ্য এটা ওর স্বভাব। শুধু আমার বেলায়ই নয়। যার সঙ্গে ওর সামান্য পরিচয়ও আছে, সেও যদি ওর কাছে এসে একবার প্রয়োজনের কথাটা জানাতে পারে, তা হলেই, যেভাবেই হোক তার প্রতিকার করার চেষ্টা করবে। ও আজো কি করে এই গুণগুলোকে ধরে রেখেছে ভাবতে বড় অবাক লাগে আমার। আমি তো পারি না! যাকে চিনি না, তার ক্ষেত্রে আমি রূঢ়, অবিনীত। অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিতদের সম্পর্কে আমার কোনোরকম মাথাব্যথা নেই। আমি তো জগতের তাবৎ মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করতে আসিনি। আমি ঈশ্বরের প্রেরিত কোনো দূতটুতও নই। আমি পরিত্রাতা নই। আমি অতি সাধারণ,

ক্ষুদ্র এক মনুষ্য জীব মাত্র। আমার লোভ, লালসা সবই আছে। ইহলোকই আমার সব। অমলের মতন ওসব বড় বড় ব্যাপার না ভাবলেও আমার চলে যায়। ইদানীং আমাকে নিয়েই আমি মেতে আছি। অন্য দিকে চোখ ফেরাবার আমার সময় নেই। আগ্রহও নেই। আমি গোপনে গোপনে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিলাম।

মোট কথা, আমার আরো অর্থের দরকার। এ ব্যাপারে আমার বউ রত্নার উৎসাহই বেশী। রত্নার পরামর্শে ও জেদের জন্যেই শেষ পর্যন্ত ছেলেদুটোকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করানো হলো। স্কুলের গাড়িতেই ওরা যাওয়া-আসা করে। প্রতি মাসে এ জন্যে আমি মোটা একটা অঙ্ক খরচ করি। ইদানীং দেখছি, খরচের অঙ্কটা যেন খুব তাড়াতাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে এগুচ্ছে। তাছাড়া রত্নার চাহিদাও কিছু কম নয়। যেমন, গেল মাসে ও একটা ফ্রিজ কিনেছে। তার আগে রেকর্ড-প্লেয়ার। প্রতি মাসেই কিছু কিছু রেকর্ড কিনতে হয়। সোফাসেট, টেপ-রেকর্ডার, স্টীলের নতুন নতুন চেয়ার, স্টীলের আলমিরা, এগুলো আমাকে রত্নার জন্যেই কিনতে হয়েছে। দিন দিনই রত্নার বায়না যেন বাড়ছে। প্রায় প্রতি মাসেই জানলার পর্দার কাপড়, রকমারি বিছানার চাদর, ঢাকনা, কাপ প্লেট চাই। এর ওপর শাড়ি গয়না তো আছেই।

ইতিমধ্যে আমরা পুরনো বাসা ছেড়ে দিয়েছি। এখন অভিজাত পাড়ায় নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি। ফলে, আরো হরেক ধরনের প্রয়োজন বেড়ে গেছে। মাঝে মধ্যে অসুবিধে হয়ে পড়ে। আবার ঠিক হয়ে যায় সব। মোটের ওপর, আমাকে এখন টাকার নেশায় পেয়েছে। চাকরিতে আর ক টাকা! টিউশনি করেও কুলোয় না। আরো টাকা চাই। একটু আরাম করে থাকতে না পারলে আর বেঁচে থাকা কেন! সময় থাকতে থাকতেই তো ভোগ করতে হয়। জীবনকে উপবাসী রাখতে আমার কোনো সাধ নেই। দূর দূর, যৌবনে সাধ করে কে আর যোগী হতে চায়! আমি তা চাই না, চাই না। আমি

জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ, আকণ্ঠ পান করতে চাই। এ জন্যে আমাকে আরো নানা ফন্দি-ফিকির বের করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে অমলের সেই মায়া হরিণের কথা মনে হয়েছে আমার। মায়া হরিণই বটে! আমি ধাপে ধাপে অনেকখানি নেমে গেছি। অমল আমার এই পতনের খবর রাখে না। আমি অনেক অভিনয়ও শিখে ফেলেছি। যেখানে আমার স্বার্থ, সেখানে মন ভেজাবার নরম নরম ভাষা, প্রয়োজনীয় কায়দা-টায়দাগুলো রপ্ত করে নিয়েছি। যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট, সেই ফুলগুলো এক এক করে চিনেছি। চিনতে সময় লেগেছে আমার। বুঝেছি, সংসারের সফল পুরুষের এগুলোই আসল মন্ত্র-গুপ্তি। এভাবেই একদিন বড়লোকের অনেক ফাঁকিবাজ, লালু ছেলেরা আমার নাম জেনে গেছে। তারা এসে আমার কাছে ভিড় করে। টাকার পরোয়া করে না তারা। ডিগ্রী চায়। আমার চেনা লোকদের মধ্যেই কেউ কেউ টেবুলেটার, পেপার সেটার, হেড-এগজামিনার। এছাড়াও সব জায়গাতেই আমাদের লোক আছে। বিবেক মনুষ্যত্ব! এগুলো নিয়ে অমলরা মাথা ঘামাক। আমার হাসি পায়।

এর মধ্যে একদিন অমল এসেছিল। ও যেন আরো রোগা হয়েছে। মুখের ওপর ক্লান্তির ছাপ। অনেক দিন ওর কোনো খোঁজ নিতে পারিনি। ও-ও আসেনি। আজকাল কেন জানি না, ওর সামনে বেশীক্ষণ থাকতে আমার সংকোচ হয়। বিব্রত বোধ করি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না। মনে হয়, ও যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে আমার ভেতরটা তন্ন তন্ন করে দেখে ফেলছে। আমি অস্বস্তি বোধ করি। জিজ্ঞেস করেছি, 'তোর কি শরীর-টরীর খারাপ?'

অমল ম্লানভাবে হাসল, বলল, 'না, তবে খাটুনি বেড়েছে।'

আমি বুঝতে পারছিলাম, ও আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। একটু অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। বললাম, 'তোদের হাস-পাতালে তো খুব ঝামেলা গেল।'

অমল বলল, 'তা গেছে। তবে এখন থেকে তুই চব্বিশ ঘণ্টা এক্স-রে এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলা পাবি।'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'কাগজে তো তোর খুব নাম ফেটেছে।'

অমল আবার হাসল। ওর চোখের কোলে সামান্য ব্যথা, বিষণ্ণতা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও বলল, 'বুঝলি কমল, এই ডাক্তারী পড়তে এসে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হলো। চোখের সামনে জীবন-মৃত্যুর কত খেলা দেখলাম! এখনো দেখছি। দুঃখ কি জানিস, কত মানুষ এমনিতেই অবহেলায়, উপেক্ষায় মরে গেল। তাদের প্রপার কোনো ট্রিট্‌মেণ্টই হলো না। কোনো ওষুধ পেল না তারা। কত আশা নিয়ে তারা আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা আর কতটুকু করতে পারি বল! বড় দুঃখ হয়, মানুষের এই কষ্টের আজো শেষ হলো না। নিজের কাছে কোনো সান্ত্বনাই নেই। কত দূর দূর জায়গা থেকে এই অসহায় মানুষগুলো আমাদের কাছে ছুটে আসে। কত কাকুতি মিনতি। আমাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জানি, ফিরে গেলে ওরা আর বাঁচবে না। কিন্তু উপায়ই বা কি। ক'জনকে আর আমরা নিতে পারি। ভর্তি করারও অনেক অসুবিধে। কোল্ড কেস, হয়তো ওর আগে আরো হাজার লোকের নাম আছে। ওদের সেই রুগ্ন, ক্লিষ্ট মুখগুলোর দিকে তাকাতে পারি না। হাত পা বাঁধা।' অমল ধীরে ধীরে কথা শেষ করে কেমন অন্যমনস্ক হলো। কি যেন ভাবল গভীরভাবে। মুখের ওপর কালচে একটু ছায়া। খানিক পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ও বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মৃত্যুর সাক্ষী থাকছি। বুকের মধ্যে দারুণ কষ্ট রে! মানুষ শুধু দলাদলিই করল। আসল দুঃখ বুঝল না।' ওর চোখে উদাস, কাতর দৃষ্টি।

আমি সান্ত্বনা দেওয়ার মতন বলেছি, 'এবার একটু নিজের কথা ভাব তো।'

অমল কিছু না বলে উঠে পড়েছে।

আমার ইতিমধ্যে আরো কতকগুলো পরিবর্তন হয়েছে। যেমন,

এখন প্রায়ই মদ্য-টদ্য পান করি। ক্লাবে-টাবে যাই। মোদ্দা কথা, জীবনে আমি কোনো আফসোস রেখে যেতে চাই না। কিছুদিন হলো, মিসেস সুতপা দত্ত বলে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার একটা অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এর মধ্যে আরো একটা ঘটনা ঘটে গেছে। গোপাল ওর বাবার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে আত্মহত্যা করেছে। হাসপাতালে নিতে একটু দেরি হয়েছিল। অমল ওকে বাঁচাবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। শেষপর্যন্ত পারেনি। এতে যেন অমল আরো বেশী দুঃখ পেয়েছে। ও ভেবে পায় না এভাবে মানুষ নিজেকে কেন নিষ্ঠুরের মতন শেষ করে দেয়? এর মধ্যে কি এমন জাদু আছে? কি এমন লোভ, নেশা? হতে পারে, অনেক দিন ধরেই গোপালের মনে গভীর এক দুঃখ ছিল। তাই বলে, এ-রকম একটা কাজ করতে হবে? এতে এমন কি বাহাদুরি আছে! মৃত্যু তো একদিন হবেই! এর জন্যে এত তাড়াহুড়োর কি আছে! হাসপাতালে এরকম আরো অনেক ঘটনা সে আকছার দেখছে। এ রহস্যের সে কোনো কূল-কিনারা করতে পারে না। এটা মানুষের সবচেয়ে বড় পরাজয়। বিমর্ষ গলায় ও বলেছে, 'বুঝলি কমল, এতে কোনো গৌরব নেই। দেয়ার ইজ নাথিং নিউ ইন ডায়িং। এরা আসলে কাওয়ার্ড, ভীরু। জীবনকে ফেস করতে ভয় পায়।'

আমি চুপ করে থাকি। এগুলো আমার কাছে জটিল, দুর্বোধ্য এক ধাঁধার মতন।

মাঝে আমার সঙ্গে অমলের বেশ কিছুদিন আর দেখা হলো না। পাস করে যাওয়ার পরও আরো কি সব ও পড়ছে।

হুট করে গত পরশু ও এল। ওকে আরো উস্কুখুস্কু দেখাচ্ছিল। অবসন্ন, ক্লান্ত। ও যেন আরো ভেঙ্গে পড়েছে। চোখে বিষণ্ণ ছায়া। আমার মনে হলো, ভেতরে ভেতরে ও যেন ক্রমশই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে। আমি শুধোলাম, 'খবর কি রে?'

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না অমল। পরে বেদনার্ত গলায় বলল, 'জানিস, লতুটা পালিয়েছে।'

'সে কি ?'

'হ্যাঁ, সেই লুম্পেনটার সঙ্গেই।'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওকে কি বলব ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অমলকে যেন ভীষণ দুঃখী দেখাচ্ছিল। খানিক পরে বিষণ্ণ গলায় ফের ও বলল, 'আমি ঠিক আমার অঙ্কটা আজ মেলাতে পারছি না রে! বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে।' ওর কণ্ঠে হতাশা, বেদনা।

ওর জন্যে কষ্ট হলো আমার। এরকমভাবে তো আগে কখনো ও ভেঙ্গে পড়েনি! মনের সেই জোরও আর নেই যেন। কি বলে যে ওকে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছিলাম না। আমার খারাপ লাগছিল। ওর মুখের ওপর ক্লান্তির, আশা-ভঙ্গের মলিন এক ছায়া।

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সামান্য আর্দ্র, উদাসী গলায় ও বলল, 'দেখলাম, মানুষ মানুষের দুঃখ বুঝতে চায় না। বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। বিশ্বাস কর, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

আমি চমকে ওর দিকে তাকালাম। বেশীক্ষণ ওই চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলাম না। ও যেন এখন ভীষণ, ভীষণ ক্লান্ত। আমি কোনোরকমে বললাম, 'এসব কথা তোর মুখে মোটেই মানায় না।'

অমল কি ভেবে ম্লানভাবে একটু হাসল। বলল, 'এরই মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা হলো, অনেক কিছুই শিখলাম।' কেমন নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ গলা। আমি বুঝতে পারছিলাম, ভেতরে ভেতরে ওর কষ্ট হচ্ছে। জোর করে এই কষ্টকে ও ভুলতে চাইছে। পারছে না। ওর মুখের ওপর দুর্বোধ্য, হিজিবিজি কতকগুলো রেখা ফুটে রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে ক্রমশই এক শূন্যতা বাড়ছে।

আমি নিরুত্তর। অমল একসময় বলল, 'আমি উঠছি রে!' বলেই ও উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখল কয়েক পলক। হঠাৎ যেন

ওর কি একটা কথা মনে পড়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'আজ ক'দিন ধরেই আমার কেন জানি না, একটা কথা ঘুরে ফিরে মনে হচ্ছে।' বলে থামল ও। আমি তাকালাম। অমল কেন যেন হাসল। বোধহয় ও সব কিছুকেই ঠাট্টা করতে চাইছে। হাসতে হাসতে বলল, 'আজ আমার মনে হচ্ছে, দেয়ার ইজ নাথিং নিউ ইন লিভিং।' বলে আরো যেন জোরে জোরে হাসল ও। আর দাঁড়াল না। কেমন একটু অস্বাভাবিক, উদ্‌ভ্রান্ত মনে হলো ওকে।

দু' দিনও গেল না। আজ খবর এল অমল আর নেই। ও আত্মহত্যা করেছে। খবরটা দিয়েই গৌতম চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল। আমার বুক কাঁপছিল। হাত পা অবশ-অবশ লাগছে। গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না। জিভ শুকিয়ে গেছে। আমার তেষ্টা পাচ্ছে। বুকের ভেতরটা যেন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত ও-ই হেরে গেল! বিশ্বাস হয় না আমার। বাঁচার জন্যে যে এত কথা বলত, যার মনে এত জোর ছিল, সহজে হার মানত না, ও-ই এভাবে মাথা নীচু করে চলে গেল। কার জন্যে, কার ওপর, ওর এত অভিমান, ঘৃণা? আমি যে কিছুতেই এর রহস্য ধরতে পারছিলাম না। আমি তো অনেক আগেই ওর পথ থেকে দূরে সরে এসেছি। ও কি আমার সব খবর জেনে গেছে? ও কি ভেবেছিল, আমি ওর পাশে পাশে থাকব? আরো অনেকেই থাকবে? আমিও তো ওর পাশে আর থাকলাম না। কে জানে, এখানেই ওর কষ্ট, যন্ত্রণা আরো গভীর কিনা। আমার কেন যেন আচমকা মনে হলো, ওর এই মৃত্যুর পেছনে পরোক্ষে আমার কোনো ভূমিকা নেই তো? কেন জানি না, আমাকেও এই মুহূর্তে একটা ভয় জড়িয়ে ধরছে। একটা অজানা আতঙ্কের শিরশির আমার রক্তে। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। দিনের সব আলো যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। চরাচরে যেন এক গাঢ় অন্ধকার নেমে আসছে। আমি বিমূঢ়। এই ঘোর কাটতে আমার আরো খানিকটা সময় লাগল। অমল

আর নেই, নেই, এটাই যেন আমার বুকের মধ্যে হা হা করে ছোটাছুটি করছে।

আমি একসময় আমার এই অকৃত্রিম বন্ধু অমলের শেষকৃত্য করার জন্যে উঠে পড়লাম। শ্মশানে যেতে হবে। কেন জানি না, চোখ দুটো আমার জলে ভরে উঠল। হঠাৎ যেন মনে হলো, আমাকেও তো একদিন এরকমই এক শ্মশানে, অমলের পাশেই জায়গা নিতে হবে!

কাঠের ঘোড়া

মাঝে মাঝেই আমার এমন হয়, কেন হয় জানি না। আর মনের এই অবস্থাটা চেষ্টা করেও কাউকে বোঝাতে পারি না। কেন জানি, হাতের কাছে মনের মতন কোনো উপমা খুঁজে পাই না আমি। অথচ একটা কোনো তুলনা না দিতে পারলে স্বস্তি বোধ করি না। খালি মনে হয়, আমি যেন সকলের কাছেই দুর্বোধ্য, জ্যামিতির কোনো জটিল এক্স্ট্রা, সহজে যার সমাধান সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত, তুলনা চলে এমন একটা বস্তু আমি পেয়েছি, যদিও আমার মনের মতন হয়নি। ধরা যাক, সেটা একটা মোটর গাড়ি, হ্যাঁ, যে কোনো একটি গাড়ি। স্টার্ট দেওয়া হলো, গাড়িটা চলতে শুরু করল, সামান্য চলতে না চলতেই কলকব্জায় গোলমাল, গতি থেমে গেল, ছন্দ থাকল না। আমি বলি, আমাদের জীবনটাও অনেকটা এরকম। ওই যে জন্মের সময় পা দুটো শূন্যে ঝুলিয়ে দম দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো, আমি জানি, ঘড়ির কাঁটার মতন টিক টিক শব্দ করতে করতে ওটা একসময় নির্ঘাৎ থেমে যাবে; কলকব্জা সারাবার আর কোনো সুযোগ দেবে না। নাঃ, মনোমত হলো না তুলনাটা। তাছাড়া গাড়ির সঙ্গে জীবনের মিলের চেয়ে অমিলটাই যে বেশী। তা হোক।

আমার কথা-টথা শুনে বন্ধুরা কি ভাবে জানি না, জানলেও এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আত্মীয়-স্বজনেরা আমাকে নানা উপদেশ দেয়; মা বলে, আমার স্বাস্থ্য ভীষণ ভেঙে পড়েছে, ভাল কোনো ডাক্তার দেখানো উচিত। পাড়ার ডাক্তারের ধারকরা ওষুধে আর চলবে না, এমন তো নয়, কোনো পয়সা লাগে না, দেরিতে হলেও দিতে হয়। দাদার কথা হলো, খাওয়া-দাওয়াটা একটু ভাল করা দরকার, এক-আধ টুকরো টাটকা মাছ, পোয়াটাক হলেও দুধ, একটা করে মুরগীর ডিম সেদ্ধ, হাঁস হলেও চলবে।

রাঙাদি চিঠি লেখে, ওর ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাকতে। ওর গরুটা মাসখানেক হলো দুধ দিতে শুরু করেছে। শাক-সব্জি মাছটাছ খুব টাটকা ওখানে, কাছেই নদী, জেলেরা মাছ ধরে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যায়। আসল কথা, আমার জন্যে সবাই একটু ভাবছে এখন। মন-টাকে ফুর্তিতে রাখা, আরো নানান সব ফর্দ। আমি টের পাই, আমার জন্যে এঁদের কী গভীর উদ্বেগ, চাপা অশান্তি! হয়তো অন্যরকম কিছু ভাবছে। বেশ মজা লাগে আমার।

এ সময় কেন যেন আমার ভোলানাথবাবুর কথা মনে পড়ে। ভোলানাথবাবু আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই ছিলেন। শুনেছি, এখন আর তিনি বেঁচে নেই। আমরা তখন টেন-ক্লাসে পড়ি। তিনি প্রায় সময়ই একটা কথা বলতেন, কেন বলতেন জানি না, আমাদের জীবনের চারপাশে নাকি শুরু থেকে শেষ, একটানা নেশা আর নেশা, বহু রকমের নেশা, এক এক বয়েসের এক এক নেশা। বলতেন আর হাসতেন, আবার বলতেন। নিজের গায়ের কোঁচকানো চামড়াটা টেনে ধরে দেখাতেন: ওরে, এই যে ঢিলেঢালা চামড়া দেখছিস, এগুলো তোদের মতনই ভরাট আর কোমল ছিল একদিন। একটা মজার ব্যাপার ভেবে আমরাও খুব হাসতাম। আসলে আমরা শুনেছিলাম, ভোলানাথবাবু একটু আধটু আফিং খান। অনেক সময় ক্লাসেও তিনি ঘুমোতেন, রীতিমতন ঘুম যাকে বলে। সেদিন এর অর্থটা বুঝিনি, আজো যে পুরোপুরি বুঝেছি, এমন কথা সাহস করে বলতে পারি না। কোঁচকানো চামড়া দেখিয়ে ভোলানাথবাবু কী বোঝাতে চাইতেন! এমন কি কিছু, জীবনটা বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, অথচ কিছুই তো করা হলো না, কোনো দুঃখ, অনুশোচনা বা আত্মগ্লানিটানি? কে জানে!

আমিও বন্ধুদের বলি, এই সাজানো নেশার পাত্রগুলোই জীবনের আসল রহস্য। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এই মুহূর্তে আমি অনেক চেষ্টা করেও তা মনে করতে পারব না। ভাবটা অনেকটা এই রকম, তোমার চারপাশে প্রকৃতির এত যে ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার ছড়ানো, এগুলো

আর কিছুই নয়, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই এবং প্রভুর কাছে যাওয়ার জন্যেই তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। এই গাছ-গাছালি, তরুলতা পাখি ফুল ফল নদী পাহাড় ঝর্ণা সমুদ্র আকাশ সব কিছুই তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে টানছে, নিয়ত শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যাবে। তিনি করুণাময়, এসবের ভেতর দিয়েই তাঁর করুণা অজস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে।

মাঝে মাঝে প্রান্তরে আঁধার নেমে এলে, সেই আঁধারে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে অনন্তবিস্তার নভোলোকের দিকে চেয়ে থেকেছি, রক্তের মধ্যে যেন কিসের উত্তাপ তখন। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সব যেন ভুলে যেতাম, পাহাড়ে চড়ে গাছপালা পাখি দেখতে দেখতে মনে হতো, আমার এই আস্ফালনের কোনো মানে হয় না। আমি কত তুচ্ছ, কত সামান্য! এরকম আমার প্রায়ই হয়। এও এক ধরনের নেশা।

ভোলানাথবাবু মাঝে মাঝে নিজের কাছেই অদ্ভুত সব প্রশ্ন করতেন, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন স্ত্রী-পুত্র সংসার এগুলো? এগুলোও নেশা, তবে এর রঙটা একটু ভিন্ন। সিঁড়ির মতন সব সাজানো। ধাপে ধাপে নেমে গেছে। প্রতিটি সিঁড়িতেই আমাদের পা রাখতে হয়। একেবারে শেষ সোপানে পা দিয়ে মনে হয়, সত্যি ভেলকিবাজির মতন সবই ফুরিয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল। আর যা গেল, তা ফিরে পাওয়া যাবে না।

মাঝে মাঝে এর নেশা আবার কেটেও যায়, যেমন আমার হয়। সিঁড়ির প্রায় মাঝামাঝি এসে আমার হঠাৎ মনে হয়েছে, আমি কিছুই এখনো করতে পারিনি। এতদিনে ভাল ভদ্রগোছের একটা চাকরি আমার পাওয়া উচিত ছিল। আমি তা এখনো জোগাড় করতে পারিনি। অফিসের মাছিমারা এক কেরানী। এমন কি, বিয়েও না। আমার হাত থেকে এই সময়টা টুক করে কখন পড়ে গেছে।

এই ঘোর ঘোর অবস্থায় আমার অনেক কিছুই মনে হয়। সব কিছু কেমন বাসি, আবর্জনার সামিল। কোনো কিছুতেই আর উৎসাহ

বোধ করি না তখন। কিছুই ভাল লাগে না আমার। এই বেঁচে থাকাটা আমার কাছে কারো একটা খেয়াল বলে মনে হয়। দুম করে অফিস যাওয়া বন্ধ করে দিই আমি। রোজ রোজ ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে ধাক্কা, মারামারি করতে করতে কাজে যাওয়া একঘেয়েমি। এই একঘেয়েমি আমার ভীষণ অপছন্দ। যদিও বড়বাবু এতে ক্ষুণ্ণ হবে জানি, তবু, তবুও না। অথচ কোনো কারণ নেই এর। মনে হয়, আমার বুঝি দম ফুরিয়ে যাবে। কত হিজিবিজি ভাবনা। কেন এমন হয় আমার! এ বয়েসে তো এসব হওয়ার কথা নয়। চোখের সামনে আমি বাবাকে দেখেছি; একটা সময় কী দাপট নিয়েই না সংসার করেছেন আমার বাবা। রেগে গেলে বাবার সামনে দাঁড়াতে আমার বুক কী টিপটিপই না করত! বাবার অন্যরূপও আমি দেখেছি। অথচ সেই বাবাকেই একদিন আমাদের চোখের সামনে অন্যরকম হতে দেখেছি। সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কেমন উদাসী পুরুষ হয়ে কাটিয়ে গেছেন শেষের কটা বছর। তিনি যে চলে যাবেন, এটা কি আগে থাকতেই টের পেয়েছিলেন? ভেবে দেখেছি, বয়েস হলে বোধ করি এমনটাই হয়। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপরও প্রবীণতার ভীরু ভীরু ছায়া নেমে আসে। হয়তো, এই-ই জীবনের শর্ত, ধর্মও বলা যায়। বৈরাগ্যের সুরে মন-প্রাণ ভরে থাকে, কোনো অসীম শক্তিমান জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে যেন নিবেদিত। এ সবই আমার অনুমান। মনের মধ্যে একটা কথা ভাঙা রেকর্ডের মতন কেবলই ঘুরপাক খায়। পৃথিবী, তাই বা কেন, নিজের রচিত বাসভূমি ছেড়ে যাওয়ার সময় সব মানুষেরই কি এমন হয়? একধরনের বৈরাগ্য, নিস্পৃহ নির্বিকার ভাব? হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক, কেননা, ভরা যৌবনও একদিন শেষ হয়ে আসে। রূপান্তর তো প্রতি মুহূর্তেই।

আমার মনের এই আবছা ছবিটা স্পষ্ট হলো, বাবা যেবার মারা গেলেন। অবশ্য ছোটখাটো কাজ অনেক আগে থাকতেই শুরু হয়েছিল। সেবার এই ঘোরভাব কাটতে আমার বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। আমার খালি মনে হতো, আমার সঙ্গে বাবার সম্বন্ধটা

কি শেষ হয়ে গেল? অনেকেই অনেক কিছু বোঝাত, আমার শোক যাতে কমে। কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না। আমার শোক আরো বাড়তই এতে। আশ্চর্য, বাবার তৈরী সাজানো সংসারেই আমি হাঁটাচলা করে বড় হয়েছি। অথচ সেই বাবাই চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আমি জানি না; শাস্ত্র যেভাবে বলে এতদূর আমি ভাবতেও পারি না, আসলে আমার অনুভূতি এতদূরে যায় না। বাবা কি সেই পরম কোনো কাম্য ধামে গেছেন? আমিও কি ওখানেই যাব, মা, ভাই-বোন, আমরা সবাই?

আমার শুধু মনে হতো, চোখের সামনে একজন মানুষকে দিনরাত দেখেছি, এখন দেখছি না। অথচ তাঁর সব কিছু এখানে পড়ে থাকল, স্মৃতির মতন। জামা কাপড়, দাবা খেলার সরঞ্জাম, এমন কি বাবা বাড়িতে যে খড়মজোড়া পরতেন তাও রয়েছে, তাঁর ভালবাসার সবই তো পড়ে রইল! আমি এগুলো দেখি আর দেখি! বুকের ভেতরটা যে কী করে না তখন! আমার মা, মাও কি এভাবেই চলে যাবে? মার দিকে চাইতে আমার কী যে কষ্ট হয়!

আমার ঘরের কোণে বাবার আরো একটা জিনিস রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার মনের মধ্যে কেমন যেন করতে থাকে। বহুকালের কাঠের একটা ঘোড়া। একটা পা ভেঙে গেছে, অকেজোর মত এক কোণায় পড়ে থাকে। রথের মেলা থেকে বাবা আমার জন্যে কিনে এনেছিলেন। ছেলেবেলায় রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুরের গল্প শুনতে শুনতে আমি নাকি বায়না ধরেছিলাম, আমারও পঙ্খীরাজ চাই। বাবা বলেছিলেন, রথের মেলা থেকে সেই পঙ্খীরাজ তিনি এনে দেবেন। আমি ছটফট করি। শেষে এক রথের দিনে আশায় আশায় থেকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একসময়। বাবা আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে পঙ্খীরাজের ওপর বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'এই নে খোকা তোর পঙ্খীরাজ, এর পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকন্যেকে আন গে যা এবার।' মা খুব হাসছিল, আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছিল।

মনে আছে, সেদিন থেকেই এই কাঠের ঘোড়াটা আমার মস্ত বড় সঙ্গী হয়েছিল। ওর পিঠে চড়ে আমি 'হ্যাট-হ্যাট' করে বেত মারতাম, ভাবতাম, ওটা আমাকে শেষপর্যন্ত তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে সেই রাজকন্যের কাছে নিয়ে যাবে, আরো কত কি! সাত সমুদ্র তের নদী ডিঙোব, পাহাড় টপকাবো, আহা রে কত স্বপ্ন! মাস যায়, বছর ঘুরে, বয়েস বাড়ে, এমনি করেই আমার কাছে একদিন মনে হলো, এটা আসল পঙ্খীরাজ নয়। নেহাতই কাঠের একটা ঘোড়া! পা ভেঙে এখন ঘরের এক কোণায় পড়ে আছে। ওর জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়েছিল একদিন। আমাকে কেমন ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছিল ঘোড়াটা। এসব মনে হলে, আমার হাসিও পায় কখনো-সখনো। আমার আর প্রয়োজন নেই এর। নেই, তবুও দেখছি আছে। যেমন, ছেলেবেলার কিছু কিছু পুতুল এখনো মা কাচের সেলফে সাজিয়ে রেখেছে, এইরকম অনেকটা। আমি দেখেছি কোনো কোনো সময় মা ওগুলোর দিকে কেমন মমতার চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, কোনো খেয়াল নেই। মা অনেক সময় আবেগের গলায় বলত, 'এই যে চীনামাটির পুতুলগুলো দেখছিস না খোকা, ওগুলো তোর ঠাকুরমার ছিল, বাউল আর পাল্কীটা আমার, তোর বাবার ওই ঢাউস লাটাই।' আমার দাদার এবং দিদির খেলনা-গুলোও মা এইভাবেই সাজিয়ে রেখেছিল। এর মধ্যে মার একটা তানপুরাও আছে, তার ছিঁড়ে গেছে। অনেক আগে মা তানপুরা বাজিয়ে গান গাইত। যন্ত্রটার গায়ে এখন পোকায় কাটার ফুটি ফুটি দাগ। পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। পুরনো কাপড়ে জড়ানো। আমার ধারণা, এজন্যে মার চাপা এক বেদনা আছে। এসব দেখেটেখে আমার মনে হতো, কোনো যাদুঘরের মতন যেন আমাদের পরিবারের ছেলেবেলাগুলোকে এখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, একে একে সবাই এসে দেখবে। এগুলোই কি আমাদের কুলুজি, পরিচয়পত্র? কখনো কখনো আমার কাছে, মার এই ছোট্ট যাদুঘরটাই যেন আরো বড় হয়ে যায়। আমার তখন মনে হয়, আমরা আজ যেভাবে যাদুঘরের

জিনিসগুলো দেখছি, আমাদেরও সেইভাবেই অনেকে দেখবে। কিছুই আমরা লুকোতে পারি না, ফাঁকি দিতে পারি না। একদিন না একদিন আমরা সবাই এই যাদুঘরের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যাব। পরবর্তীকালের মানুষ এসে আমাদের সব কীর্তি, অপকীর্তি দেখবে। কিছু নেবে, কিছু বা ফেলে দেবে, যেমন, আমি আমার কাঠের ঘোড়াটা এখন ফেলে দিয়েছি।

এই বোবা জবুথুবু ঘোড়াটার দিকে চেয়ে থাকলে, কেন জানি না, আমার সুধার কথা মনে পড়ে। সুধা আর আমি একই সঙ্গে কলেজে পড়েছি। আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের, ছ-সাত বছরের কম হবে না। সুধার চেহারাটা একটু গোলগাল, গায়ের রং ফরসা, মাথা ভরতি কোঁকড়ানো চুল, ঠোঁট দুটো সামান্য পুরু, একটু বেঁটে, চোখজোড়া টানা টানা, মুখের গড়নটা পানের মতন, ভারী সুন্দর দেখাত ওকে, প্রতিমার মতন। শেষের দিকে ওকে দেখলে আমার কেন যেন দশমীর দিনের প্রতিমার কথা মনে পড়েছে। সারা চোখেমুখে কী এক দুঃখ যেন লুকোনো রয়েছে, সেটা কি, আমি কোনো সময়ই জানতে পারিনি। সুধাকে আমি ভালবাসলাম, সুধাও আমাকে। পড়া শেষ করে আমি তখন চাকরির চেষ্টা করছি। এমন সময় সুধা এসে একদিন আমায় জানাল, 'আমি আর পারছি না, কি করবে বল।'

'মানে?'

'মানে খুব সোজা, বাড়ি থেকে আমার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে।'

'খুব ভাল কথা। আমাদের ব্যাপারটা দেখছি তোমাদের বাড়ির লোক এখনও জানে না কিছু।'

'এখনও বলিনি আমি।'

'আরো আগেই বলা উচিত ছিল তোমার।'

'বললে আর রক্ষে রাখবে না মশাই, এখন যাও বা একটু-আধটু দেখাটেখা হয়, পরে আর তাও হবে না।' সুধা আমার দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়ে হাসছিল। আমিও হাসতে হাসতে বলেছিলাম, 'একদিন তো বলতেই হবে।'

'তা তো হবেই, কিন্তু—' সুধা আমার চোখে চোখে চেয়ে হাসল।

'কি ?' হাসি হাসি চোখে আমি দেখছিলাম ওকে।

'কি আবার, তাড়াতাড়ি ভাল দেখে একটা চাকরি-টাকরি জোগাড় কর তো।'

ওর কথাটা খট করে আমার কানে লেগেছিল। সমস্ত সুরটাই যেন আচমকা কেটে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আমার চোখের ওপর থেকে হাসিটা মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একটু সময় চুপ করে থেকে আমি সামান্য নিস্পৃহ গলায় বলেছিলাম, 'হুঃ, ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া, পেলেই এখন বর্তে যাই।'

'তুমি না বলেছিলে, আই. এ. এস. বা ডব্লিউ.বি.সি.এস. পরীক্ষা দেবে ?'

'না—, ওসব প্ল্যানট্যান এখন বাদ।'

'খুব ভুল করবে।' একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে ও ফের বলেছিল, 'সংসার করতে হলে অনেক পয়সার দরকার, তাছাড়া বলার মতনও কিছু একটা চাই।'

আমিও জানি, সংসার করলে পয়সার দরকার এবং বলার মতন কিছু অহংকার বা গৌরব আমাদের সকলেরই থাকা উচিত, তা না হলে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তবে সুধার ভাবনার সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখছি মিলছে না। আমি সুধাকে বোঝাতে চেয়েছি। বেশ বড় গোছের কোনো চাকরি করলেই সংসারে সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না সুধা। সব সময় মর্যাদা বাড়ে না এতে। বাইরেটাই সব নয়, ভেতরের মানুষটাকেই চিনে নিতে হয়। আমাদের চাওয়ার তো শেষ নেই, একটা থেকে আর একটা বেড়েই যায়। কোথাও না কোথাও তোমাকে থামতে হবে, এই থামতে জানাটাই তোমার শিক্ষা, মর্যাদা ; এটাও তোমার অহংকার করার বিষয়। মনটাই আমাদের সবকিছু। বেঁচে থাকা মানেই তো এক ধরনের সংগ্রাম, মনের প্রস্তুতি সুধা। আসলে ও আমাকে বুঝতে পারেনি। অথচ এটা আমার আগে কখনো মনে হয়নি।

এর পর আমি একটা চাকরি জোগাড় করেছি। খুব সাধারণ, বলার মত কিছু নয়, স্টেট গবর্ণমেণ্টের এল. ডি. ক্লার্ক। সুধা এজন্যে আমার ওপর খুশি নয়, কেমন যেন ও চুপসে গেছে। কথায় কথায় ও আমাকে একদিন বলেছিল, 'তুমি যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছ। আগের সেই উদ্যম, চটপট ভাব আর নেই।'

আমি বলেছি, 'দেখলাম কোনো লাভ নেই, ডব্লিউ. বি. সি. এস.টা দিয়েছিলাম, হলো না। এজন্যে অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। আমিও চাই না, এটাই আমার একমাত্র পরিচয় হয়।'

'একবার হয়নি তো কি হয়েছে, আবার দাও।'

'ধুৎ—।'

'জান, আমার আরো একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলের অবস্থা ভাল শুনেছি, স্টেট ব্যাঙ্কের বড় অফিসার। আমার বাড়িও এটা হাতছাড়া করতে চায় না!' ওর কথা শুনতে শুনতে আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, সুধা যেন আমার অচেনা, মেয়েটা বড় লোভী।

কেন জানি, আমার কাছে আসা কমিয়ে দিয়েছিল সুধা। আমি বুঝতে পারছিলাম ও আমার কাছ থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। শেষ যেদিন ও এসেছিল, বলেছিলাম, 'আমি নিজেই এবার তোমার বাবা-মা-র কাছে যাব। সব ব্যাপারটা ওদের বলব।'

'কি বলবে?' সুধার গলা কাঁপা কাঁপা শোনাচ্ছিল।

'তোমার আমার সম্পর্কের কথা বলব। বলব, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।'

'তাহলেই হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তোমায় পাল্টা প্রশ্ন করবে, তুমি কোথায়, কোন ধরনের চাকরি কর, কত মাইনে পাও, নিজের বাড়ি-ঘরদোর আছে কিনা, তোমার সংসারে কে কে আছে ইত্যাদি; তুমি জবাব দিতে পারবে এ সবের?'

'কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব। আমি তো কিছু লুকোতে চাই না, লুকোব কেন? হয়তো আমার উত্তরগুলো ওদের মনের মতন

হলো না, তাতে কি! তাই বলে আমার তো ভালবাসা মিথ্যে নয়, জাল নয়।'

'ছেলেমানুষি করো না; তারচেয়ে আরো ভাল একটা চাকরির চেষ্টা কর।'

এরপর সুধা আর আসেনি, আমিও আর যাইনি ওদের ওখানে। সুধাকে আমার বড় স্বার্থপর বলে মনে হয়েছে। শুনেছি, সুধার বিয়ে হয়েছে, পাত্র স্টেট ব্যাঙ্কের ওই ছেলেটি। এরপর সুধা সম্পর্কে একটা কথা আমার কেন যেন বার বার মনে হয়েছে, সুধার লোভ কি ওখানেই থেমে থাকবে? ওর মনের রোগ বড় মারাত্মক। ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে। আমার ভালাবাসায় কোনো ভেজাল ছিল না। বাইরেটাই ওর সব হলো! আমার মন, আন্তরিকতা?

এই চিন্তাগুলোই আমাকে বেশ কিছুদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ভাবতে খুব খারাপ লেগেছিল। অতি সাধারণ, লোভী একটা মেয়েকেই আমি রূপকথার সেই রাজকন্যে বলে ভুল করেছিলাম। সুধা কি সুখী হয়েছে? আজকাল কেন যেন ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। ইদানীং দেখছি, আমার এই কাঠের ঘোড়াটার সঙ্গে আমারও কোথায় একটা মিল আছে। সুধা কি এখন যাদুঘরের কোনো সামগ্রী?

এ সময়টা আমার কাছে অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতন, কিছু মনে করতে পারি, কিছু পারি না। আমি সবাইকেই খুব ভাবিয়ে তুলেছিলাম। বাবা মারা যাবার সময়ও নাকি আমার এমন হয়নি; ক'দিনেই সামলে উঠেছিলাম। সুধা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। ঘোর ভাবটা কাটবার পরও মাঝে মাঝে আমি ভেবেছি, ওর সঙ্গে আবার যদি কখনো দেখা হয়, জিজ্ঞেস করব, 'আমি তোমার কি ক্ষতি করেছিলাম সুধা, কি করেছিলাম? তুমি কি আমাকে চিনতে না, বুঝতে পারনি? এতগুলো বছর তোমার কাছে এমনই মিথ্যে হয়ে গেল!' হয়তো আরো, আরো কিছু ভেবেছি, এখন আর সব মনে নেই। এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি, আমাদের প্রিয় কোনো কোনো

বস্তুর বিনিময়েই, বড় কোনো অনুভবকে পাই। কি সেই অনুভব? আমিও কি তা পেয়েছি? সুধা আমাকে দুঃখ বরণ করার মন্ত্র শিখিয়ে গেছে। তবু, তবু কি আমি সবটা পেরেছি? অন্ধকারে এখনো যে আমার ভয়!

এখন আবার মনে হচ্ছে, আমার দম ফুরিয়ে যাবে। এই ক্রমাগত ছুটে চলা অর্থহীন। কিছুই ভাল লাগছে না আর। দাদার চোখেমুখে আবার পুরনো সেই ভাঁজ ফুটে উঠছে। মা, আমার বুড়ী মা, এবার যেন কেমন ভেঙ্গে পড়ছে। আমি যে ওদেরকে আমার কষ্ট বোঝাতে পারি না। এই সমুদ্র আকাশ গাছপালা পাখি আমাকে নিয়ত টানছে, টানছে শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যাবে বলে। এক ধরনের বৈরাগ্য যেন পেয়ে বসেছে আমায়। আমি বুঝতে পারছি, আমার চারপাশে কালো কালো টুকরো মেঘ জমেছে, গভীর কোনো অন্ধকারের মধ্যে ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। মগজের মধ্যে সারাক্ষণ কি কুট কুট করে। অস্বস্তি। বেঁচে থাকার কোনো অর্থ ই হয় না। আমাদের সমস্ত সাধনাই বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেছে।। অহংকার করার মতন কি থাকল আজ? ওই অমিয়ই এসব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে আমায় ফেলে দিয়েছে। কেমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে সব। আমি কি এর ভেতর থেকে বেরোতে পারব আর? বাঃ, বারে অমিয়!

অমিয় আর আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু। একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে কাজ করি। কতদিন অমিয় আমাকে টানতে টানতে ওর বাড়ি নিয়ে গেছে। ছোট ছোট পাঁচটি ভাই বোন ওর। মা আর বাবা অনেক দিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছে। অমিয় আমাদের অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারী। তারপর থেকেই দেখেছি ও বদলাতে শুরু করেছে। ওর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার বিরোধও।

এমনিতেই আমি কারো সঙ্গে বড় একটা মিশি না, কেন যেন ভাল লাগে না আমার। সেজন্যেই অমিয় ছাড়া আর কোনো বন্ধু নেই আমার। পরিচিত কিছু মুখ অবশ্য বিভিন্ন সময়ে আমি মনে করতে পারি। শুধু অফিসেই নয়, পাড়ায়ও তাই। নিরিবিলি থাকতে

আমার ভাল লাগে। প্রাণ খুলে মিশতে আমার ভয় হয়। সবাই বলে একটু অসামাজিক আমি। কি কথা বলব? আমি তো জানি, অফিসে, পাড়ায় দিনের পর দিন বলতে বলতে কথাগুলো বাসি হয়ে গেছে। আমি কোনো উৎসাহ বোধ করি না।

অমিয় আমাকে সুযোগ পেলেই বোঝাবার চেষ্টা করে, 'দেখ শৈলেন, এভাবে পালিয়ে বাঁচা যায় না, বি অ্যাকটিভ।' আমি দেখেছি কথা বলার সময় ও বেশ আবেগ বোধ করে! ওর অ্যাকটিভ কথার অর্থ আমি বুঝি। ও চায় আমিও যেন ওর মতন জড়িয়ে পড়ি। অফিস, মিটিং, মিছিল, শ্লোগান মোটকথা ওর ইচ্ছে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আমিও যেন একজন সক্রিয় নট হয়ে চিহ্নিত হই। এসবই এখন অমিয়র ধ্যান-জ্ঞান। তা হোক, আমার কিছু বলার নেই। অনেকেরই অনেক রকম নেশা থাকে।

আমার কেন যেন হাসি পায় ওর কথাগুলো শুনে। আমি বলি, 'রাগ করিস না ভাই, তুই যে বাঁচার কথা বলছিস, আমার কাছে ওটা বড় ছোট, আমি কিন্তু আরো ভালভাবে বাঁচতে চাই।'

'তোর এই হেঁয়ালির কথা আমার ভাল লাগে না। এসব ভাবের কথা ছেড়েছুড়ে এবার একটু কাজে-টাজে নাম।'

'কাজ মানে তো তোর ওই মিছিল আর বড় বড় গালভরা সব কথা।'

'গালভরা কিরে, দাবি-দাওয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ!'

আমি হাসতে হাসতে বলেছি, 'তার মানে আরো অন্যায় করতে বলছিস?'

'তোর মাথাটা দেখছি একেবারেই গেছে।'

জবাবে বলেছি, 'ঠিক বলেছিস। তাহলেই বোঝ, এই আন্দোলনে আমার মতন ভোঁতা দু-একটা মাথা বাদ গেলেও কোনোও ক্ষতি হবে না।'

'এমনও তো হতে পারে, মাথাটা তোর দামী, তাই এত লোভ।' অমিয় ঠাট্টা করেছিল, হয়তো খোঁচাও ছিল। এসব অভ্যেস ওর

আগে ছিল না। ইদানীং দেখছি, এ ধরনের একটা অসহিষ্ণু মন ওকে আরো যেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

অমিয় আবার বলেছিল, একটু শ্লেষও ছিল বলার মধ্যে, 'তোর ভালভাবে বাঁচাটা শুনি এবার।' ও হাসছিল কেন যেন।

'বাঁচা বলতে তোর ধারণাটা আগে শুনি একবার।'

অমিয় হাত নেড়ে নেড়ে একটু উঁচু গলায় বলেছিল, 'কেন, বাঁচা মানে, মোটামুটি খেয়েপরে মানুষ টিঁকে থাকবে, অসুখটসুখ হলে চিকিৎসা হবে, অভাবে অবহেলায় মরবে না। এইজন্যেই আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম।'

'ব্যাস, এতেই বাঁচা হয়ে গেল!'

'তবে আর কি!'

'আগে একটা কথার জবাব দে তো, আমার এই বেঁচে থাকার দরকারটা কেন, আমি মরে গেলেই বা কি ক্ষতি?'

'আচ্ছা ঝামেলা তো, মরবটা কেন আমি?'

'সবাইকেই মরতে হবে, এটা কোনো কথা নয়। আসল কথা, যা আমি বলতে চাইছি, তা হলো নিছক দেহটাকে খাইয়ে পরিয়ে টিঁকিয়ে রাখলেই বাঁচা হলো না, এর একটা উদ্দেশ্য আছে, অর্থ আছে।'

'সেটা আবার কি বস্তু?'

'আমার জিজ্ঞাসাও তো এই। শুধু এটুকু মনে হয়েছে, কোনোরকমে প্রাণধারণটাই বাঁচা নয়, এ কখনো বাঁচা হতে পারে না। প্রত্যেকের কাছেই এর একটা উদ্দেশ্য, একটা অর্থ থাকা চাই।'

'অর্থ আছে, নিশ্চয়ই আছে। তবে তোর সাথে মিলবে না।'

'মিলতো, যদি দৃষ্টিটা তোর আর একটু খোলা হতো।'

এসব অনেক ব্যাপারেই আমাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে। আমরা কেউ কাউকে নিজের জায়গা থেকে সরাতে পারিনি। তাছাড়া আমার এমন কোনো আগ্রহও ছিল না যে ওকে দিনের পর

দিন নাছোড়বান্দার মতন চেষ্টা করে আমার মতে বশ করব ; কিন্তু ও আমাকে সেই চেষ্টা ছিল।

অমিয় আমায় কতরকম করে বোঝাত, বাঁচতে গেলে লড়াই করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, লড়াই করেই বাঁচতে হবে। আজ হোক, কাল হোক, প্রত্যেককেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সামিল হতে হবে। আর দেরি নেই, দেরি নেই রে! দিন বদলের পালা এল বলে, ইত্যাদি আরো কত কি।

আমি কোথাও এর মিল খুঁজে পাই না। আমার কথা হলো, সবাই যদি দেশের এবং দশের মঙ্গলের কথা ভাবছে, তবে আর নিজেদের মধ্যে এত রক্তারক্তি কেন? বিরোধটা তাহলে কোথায়? এত প্রাণ বলি হলো কেন? এই নৃশংসতার কি কোনো পরিমাপ করা যায়? অমিয় এসবের কোনো জবাব দিতে পারেনি। মানুষের দীর্ঘদিনের এত সাধনা মুহূর্তে এমন তুচ্ছ, আবর্জনার মতন হয়ে গেল কি করে?

একদিন অমিয় এসে আমায় বলল, 'পাড়াতে আর থাকা যাবে না, গণ্ডগোল। আমাদেরই দলের একজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে ছুরি মেরেছে, পরে গলার নলিটা কেটে ফেলে চলে গেছে, দিন-দুপুরে, অনেকেই তা দেখেছে।'

আমার খারাপ লাগছিল শুনে। এত অসহায় আমরা? তবে আর বাঁচার কি মূল্য? যে-কোনো মানুষ যে-কোনো লোককে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে? এ কোন্ বীভৎস, নির্মম ছবি দেখছি আজ? আমার মনে হতো, যারা মরেছে তারা তো আমাদেরই স্বজন, প্রিয় সব আত্মীয়! যারা থাকল, তারা কি নিয়ে বাঁচবে? কোন্ মূল্যবোধ? আমার উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছিল। ভয়ও। কাগজ খুললেই খুন আর খুন। এত অস্থিরতা, অসহায় ভাব আর কখনো তো দেখিনি আমি। মনের মধ্যে সারাক্ষণ এক অস্বস্তি, যন্ত্রণা। বিশ্রী রকমের গা-গুলোনো অনুভূতি। ভালভাবে খেতে-টেতেও পারতাম না। আকাশে শকুন উড়তে দেখলে আমার

খারাপ লাগত। অমিয়র কথা শুনে আঁতকে উঠেছিলাম। ওকে মারবার চেষ্টা করেছিল, অল্পের জন্যে ও বেঁচে গেছে! আমার বুক কাঁপত এসব ভাবলে। অমিয়কেও পাড়া ছেড়ে দিতে বলেছি, 'একটু সাবধানে থাকিস টাকিস।' সর্বত্র একই ভয়, একই চিত্র। এরা কি কখনো রক্তের স্বাদ বদলাতে পারবে?

কাল অফিসে গিয়ে মাথাটা আমার ঘুরে গেল। অমিয় আর নেই। অমিয়কে ওরা মেরে ফেলেছে। আমার শুনতে শুনতে গা-হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। আমি রীতিমতন কাঁপছিলাম, ভয়ে আতঙ্কে। কত রকমের কানাঘুষো। ওর বাবার অসুখটা খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। অবস্থা খারাপ শুনে ও দেখতে গিয়েছিল। আবার কেউ বলল, বাস থেকে টেনে নামিয়ে ওরা ওকে গুলি করেছে।

অমিয় তো চলে গেল, কিন্তু যারা বেঁচে থাকল, তাদের এখন কি হবে? ওর বাবা-মা, ছোট ছোট ভাইবোনগুলোর কি হবে? আমার ওকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, দেখে যা অমিয়, একবার চোখ মেলে দেখে যা, তুই এদের কী করে গেছিস; কেউ আসেনি রে তোর মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিতে, একটু সাহায্য করতে। লড়াই করে না বাঁচতে হবে! আমার চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

আমি এখন আর অফিস যাব না ক'দিন। কিছুই ভাল লাগছে না। জীবনের অর্থ টা তাহলে কি? ভেবে ভেবে এখন আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। সব কেমন অর্থহীন, উপহাসের মতন লাগছে। যেন নিছক কারো একটা খেয়াল মাত্র। আমার মার যাদুঘরের কথা আবার মনে পড়ছে কেন? বাবার মুখটা ভাসছে। বাবা আমার জন্যে রথের মেলা থেকে একটা কাঠের পঙ্খীরাজ এনে দিয়েছিলেন। আমার ঘোড়াটা গেছে, আহা রে পঙ্খীরাজ, তোর একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে! আমি, আমি যে তেপান্তরের মাঠ পেরোতে চেয়েছিলাম! রাজকন্যে আনব বলে সমুদ্র ডিঙোতে চেয়েছি! সুধা, এ তুমি কি করলে বল না! তোমার স্বামী বড় চাকরি করে, না? আমাকেও

আই.এ.এস. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে বলেছিলে না? আমার মায়ের মুখটা বড় করুণ, দুঃখীর মতন দেখাচ্ছে! কেন? ওরকম হলো কেন? রাঙাদিও না জানি, কত কি ভাবছে আমার জন্যে! হা-রে-রে করে কালো কালো মেঘগুলো ছুটে আসছে। হায়রে, কত দুর্লভ সময় এভাবে আমার চলে গেল! এসব কেন আমার মনে আসছে! এই কি আমাদের শুদ্ধতার দিকে যাত্রা? অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার প্রস্তুতি? আমি তো তিরিশ বছরের একজন যুবক! আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে, ঘুরছে। কাঠের ঘোড়াটা···তানপুরা, তানপুরাটা···মা-র যাদুঘর···চীনামাটির পুতুল···বাবার লাটাই··· সুধা···অমিয়···মিছিল···শকুন···খুন···তিরিশটা··· বছর···গাছপালা আকাশ সমুদ্র···শুদ্ধতা···বাঁচার উদ্দেশ্য?···বড় ক্লান্তি,···ক্লান্তি···খুব তেষ্টা! আমার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে···ঘুম!

করাত

কৃষ্ণা এখন প্রায় রোজই আমাকে অফিসে ফোন করে। অবশ্য ছুটির দিনগুলো বাদ। ফোন করার সময়টাও ওকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। ঠিক দুটো থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। কারণ, এ সময় আমার হাতে প্রায় কোনো কাজ থাকে না। হাত-পা ছড়িয়ে একটু আরাম করতে পারি, সহকর্মীদের সঙ্গে হালকা মেজাজে ইয়ার্কি-রসিকতা করার খানিকটা অবকাশ পাই। এর পরই আবার লোকজন আসতে শুরু করে। শেষ বেলায় ফের একটু কাজের চাপ পড়ে। একেই বলে মার্কেণ্টাইল ফার্ম। যেমন পয়সা, খাটুনিও তেমনই। প্রথম প্রথম ও একটু-আধটু ভুল করত, মানে, অনেক আগেই ফোন করত। কিন্তু তখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। রঙঢঙ করে কথা বলার সুযোগ কই! এখন আর ও সেরকম ভুল করে না।

আজকাল এমন হয়েছে, ওই বিশেষ সময়টায় আমিও ওর একটা ফোনের জন্যে কেমন উদগ্রীব হয়ে থাকি। উসখুস, কাতরতা অনুভব করি। জানি, এ-রকম কৌতূহল আমার থাকা উচিত নয়। কেননা, আমার বয়েস হয়েছে, পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমি এখন একজন পোড়-খাওয়া, অভিজ্ঞ মানুষ। অনেক ঝড়-ঝাপটা আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। তাছাড়া আমার বউ ছেলেমেয়ে আছে। মেয়েটা কলেজে পড়ে। ছেলেটা আগামীবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দেবে। মোট কথা, সামাজিক মানুষ হিসেবে আমার কতকগুলো দায়দায়িত্ব আছে। আমার বউ ছেলেমেয়ে প্রিয়জনেরা তো বটেই, পাড়া-পড়শী, পরিচিত-অপরিচিত অনেকের কাছেই আমার একটা সামাজিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। হুট করে এগুলোকে বানচাল করে দেওয়া যায় না! এর পেছনে প্রতিটি মুহূর্তের ভাবনার কাটাকুটি, অস্থিরতা, যন্ত্রণা আছে! অথচ এ সংসারে এমন উচিত-নয় কাজের সংখ্যাও তো অজস্র! আমরা কি সব সময়ই তা মেনে চলি? চলা কি সম্ভব? ইদানীং, এরকম

অনেক প্রশ্ন বুদবুদের মতন আমার মনের মধ্যে নিয়ত ফুটছে, ডুবছে। মাঝে মাঝে কোনো ঝড়ো বা দমকা হাওয়ার মতন এক একটা ঘটনা আমাদের জীবনে এমনভাবে ঘটে যায়, যার হিসেব মেলানো কঠিন। আমিও আজ আমার অঙ্ক মেলাতে পারছি না যেন। জীবন কি তবে এ-রকমই ছোট-বড়, বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সব অভিজ্ঞতার এক রহস্যময় যোগফল! সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে নিজেকে শক্ত রাখার মতন যে মনের জোর দরকার, অস্বীকার করব না, তা আমার কমে গেছে। শ্রীমতী কৃষ্ণা যেন আমার মধ্যে এক নেশা ছড়িয়ে দিয়েছে। অথবা এও হতে পারে, আমার ভেতরেই এ ধরনের কোনো গোপন নেশা, লালসা চনমন করছিল, কৃষ্ণা তার অবলম্বন।

ফোনে ওর প্রায় একই বয়ান। প্রথমে কেমন আছি, কি করছি, ইত্যাদি টুকরো খোঁজ-খবর নেবে, শেষে মিষ্টি করে হাসবে। হাসতে হাসতে বলবে, 'কোনো কথা নয় গো মশায়, আমি আজ ছ'টায় মেট্রোর নিচে থাকব, চলে এসো, কেমন? না না, আসবে কিন্তু, অনেক কথা আছে।' বলে কিশোরী মেয়ের মতন খিল খিল করে হাসতে থাকবে। কে বলবে ওরও বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি!

ও সাজগোজ করে আসত। এই বয়েসেও ওর এই সাজসজ্জা আমার ভাল লাগে। দিন দিনই ওর চেহারার টান যেন আরো বাড়ছে। আশ্চর্য, এখনও রূপের কোনো ঘাটতি নেই।

সেদিন আমার যেতে একটু দেরি হয়েছিল। চেষ্টা করেও পারলাম না। শেষ সময়েও একটা ফাইল ঠিক করে আসতে হলো। আমি দূর থেকেই দেখেছি ও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। চোখে-মুখে অস্বস্তি, অস্থিরতা। আমাকে ও দেখতে পায়নি। পেছন থেকে আলতো করে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলাম।

কৃষ্ণা চমকে উঠেছে। আমার মুখের দিকে চেয়েই ও চোখ সরিয়ে নিয়েছে। মুখ ভার ভার।

আমি ওর কাঁধে আর একটু চাপ দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই, কি হলো তোমার?'

কৃষ্ণা আনত চোখে অভিমানের গলায় বলল, 'এই বুঝি তোমার ছ'টা ?'

'বিশ্বাস কর, অফিসে আজ কিছুদিন ধরে ভীষণ কাজের চাপ।' আমি এবার ওর মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মারি।

এবার আর কৃষ্ণা রাগ করল না। ফিক করে হেসে ফেলল। টান টান চোখ করে বলল, 'বোঝ না কেন, এখন কি এভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। সেই বয়েসও কি আর আছে !'

'ভালই তো লাগছিল।'

'যাও, ইয়ার্কি মারতে হবে না।' মুহূর্তে ওর চোখে-মুখে অনেক-গুলো দুষ্টুমির রেখা ফুটে ওঠে।

আমি ওর চোখে চোখে চেয়ে থাকি। ওর চোখের মধ্যে এমন এক খেলা আছে, যা দেখলে আমার বুকের ভেতরটা কিরকম শির শির করতে থাকে। মাথার মধ্যে এক ঝিম ঝিম নেশা। গলা চট চট করে। ভীষণ তেষ্টা পায় আমার। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলি ঃ আমি ঠিকই বলছি কৃষ্ণা, এখনো তোমার মধ্যে এক সম্মোহিনী মন্ত্র আছে। তুমি আমার বয়েস ভুলিয়ে দিচ্ছ। এক এক করে তুমি আমার কাছ থেকে সব সামাজিক সম্মান, মর্যাদা, চেয়ে নিচ্ছ। তোমায় ফিরিয়ে দেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। ও আমাকে মৃদু একটা ঠেলা দিল, 'এই, চুপ করে রইলে কেন, চল।'

'কোথায় ?'

'এই ভিড় আমার ভাল লাগে না।' ওর বলার ভঙ্গিতে অন্য ইঙ্গিত ছিল।

'আমিও লাইক করি না।' আমি ওর মুখের দিয়ে চেয়ে হাসি।

আমরা ট্যাক্সি নিলাম। ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম। খানিকটা হেঁটে, ফাঁকা মতন একটা জায়গা পেয়ে নরম ঘাসের ওপর বসলাম। আমি সিগারেট ধরালাম। কৃষ্ণা আমার গা ঘেঁষে বসেছে। ওর শরীর থেকে প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ আমার

নাকে ঢুকছে। ওর একটা হাত আমার হাঁটু ছুঁয়ে আছে। কপালের কাছে বাড়তি ক'টা চুল হাওয়ায় উড়ছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিল ও। পেটের কাছে আবার গুঁজে রাখল রুমালটা। মাঠের ওপর আবছা অন্ধকার। মুখ-ভরতি ধোঁয়া নিয়ে রিং করে করে ওর মুখে গায়ে তা মাখিয়ে দিচ্ছি।

কৃষ্ণা ডান হাত দিয়ে আমার মুখটা সরিয়ে দিল, 'তুমি কি গো, গায়ে গন্ধ হয়ে যাবে না?'

'হলোই বা।'

কৃষ্ণা জিভ ভেংচায়, 'আহা, কি কথা, হলোই বা!'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলেছি। বললাম, 'তোমার গন্ধ যে আমার গায়ে থাকে!'

'যাঃ—!' বলেই ও আমাকে মৃদু একটা ঠেলা মারল। মুখ টিপে টিপে হাসল। দৃষ্টি আনত।

'হ্যাঁ গো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না।'

সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না ও। কি যেন ভাবল। হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মুখের ওপর দুর্বোধ্য কয়েকটা রেখা। খানিকক্ষণ পর একটু ম্লান গলায় ও শুধলো, 'তোমার বউও কি তা বুঝতে পেরেছে?'

'মনে হচ্ছে পেরেছে, তোমাদের যা ঘ্রাণশক্তি।'

'তাহলে?' কৃষ্ণা আমার চোখে চোখে তাকাল।

'আমিও ওকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।'

কৃষ্ণা আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। এখন আর তার কিছু করার নেই। অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ফেরা না-ফেরা কোনো কিছুই এখন তার একার মর্জির ওপর নির্ভর করে না। সে-ও ভাবতে পারেনি, এত তাড়াতাড়ি এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে। কি এক দুর্নিবার নেশায় যেন পেয়ে বসেছে। একটু পরে আমার মুখের দিকে চেয়ে কেমন উদাস গলায় বলল, 'কাজটা বোধহয় ঠিক হলো না।'

'হঠাৎ এসব কথা কেন কৃষ্ণা!' আমি ওর কাঁধে একটা হাত রাখি।

কৃষ্ণা আমাকে টলটলে চোখে দেখল একটুক্ষণ। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুকের মধ্যে কি এক যন্ত্রণা টন টন করছে। অনুচ্চ গলায় ও বলল, 'কি করব বল, তোমাকে এখন একদিন না দেখলে আমার যেন কিরকম হয়। ঠিক বোঝাতে পারব না আমি।' গলাটা যেন ওর ধরে এল।

'শুধু তোমার কেন!' আমি ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করি। সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলাম। আমি ওকে আরো কাছে টানলাম।

কৃষ্ণা আমার বুকে মুখ লুকোয়। পরে আস্তে আস্তে বলল, 'সেদিন কি যে হলো, ওই ভিড়ের মধ্যে তোমাকে দেখে আমি কেঁপে উঠলাম। কতকাল পরে আবার তোমাকে দেখেছি। বুকের ভেতরটা যেন কি-রকম করতে লাগল। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। আমার মেয়েকে দিয়ে ডেকে পাঠালাম।' বলতে বলতে ওর যেন দম ফুরিয়ে যায়। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে।

'আমিও কম অবাক হইনি কৃষ্ণা।'

'বলতে পার, এরকম হলো কেন?' কৃষ্ণা ভরাট চোখে আমাকে দেখল।

'জানি না, তবে আমরা তো একদিন এরকমই চেয়েছিলাম কৃষ্ণা!'

'যখন চেয়েছিলাম, তখন আর হলো কই।'

'তবু তো শেষপর্যন্ত কিছু হলো।' আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকি। ওকে আরো ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে নিলাম। ওর বুকটা ঘন ঘন ওঠানামা করছে। আমার চোখ দুটো কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। আমার তেষ্টা পাচ্ছিল। আমি ওকে আদর করতে করতে একটু আবেগের গলায় বললাম, 'তোমাকে আবার যে কোনোদিন এমন করে পাব, ভাবিনি।'

'এ পাওয়ায় যে ভীষণ কষ্ট রুদ্রদা, আমি আর পারছি না।'

'এ কষ্টের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা আছে কৃষ্ণা।'

'আমি তো দেখছি, দিন দিনই এতে আমার কষ্ট আরো বাড়ছে।'

আমি চুপ করে থাকলাম। মনে মনে ওকে বলতে ইচ্ছে হলো : শুধু কি তোমার কষ্টই বাড়ছে, আমার নয়? পাছে তুমি কোনো দুঃখ পাও, এজন্যে আমার ঘরের কথা তোমাকে কিছু বলিনি। আমার বউ আমাকে সন্দেহ করছে। আমার ওপর ওর এখন প্রচণ্ড ঘৃণা আর রাগ। আমিও ওর সামনে আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি না। আমার সাহস কমে গেছে। তার ওপর ওর কোনো এক আত্মীয় তোমাকে আমাকে একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। কথাটা ওর কানে তুলে দিয়েছে। তারপর থেকে যেন ও আরো ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন হয়ে গেছে। কামড়ে খামচে আমার রক্ত বের করে দিয়েছে। তোমার মতন আমারও জ্বলুনি কিছু কম নয়। ভীষণ অশান্তি। একটা আগুন ঘরে এখন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে, যে-কোনো সময় তা দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে।

আমি ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে করে ডাকলাম, 'কৃষ্ণা।'

'হুঁ—!'

'বললে না তো তোমার কি এমন অনেক কথা?'

কৃষ্ণা এবার একটু নড়ে বসল। অন্ধকারের মধ্যেই চুলগুলো ঠিক করে নিতে নিতে ও বলল, 'যা বলার সবই তোমাকে বলব। তোমার কাছে না বললে যে আমি মরেও শান্তি পাব না।' ওর গলা যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে। দৃষ্টি বিষণ্ণ।

আমি ওর কথা শুনে হাসলাম সামান্য। হালকা গলায় বললাম, 'ষাট ষাট, এত তাড়াতাড়ি মরতে যাবে কোন্ দুঃখে।'

'দুঃখ—?' একটু যেন থমকে দাঁড়ায় কৃষ্ণা, পরমুহূর্তেই হেসে উঠেছে।

আমি সিগারেট ধরাই আবার। কৃষ্ণা আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছে। সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে একসময় ছোট হয়ে এল। আমার বাঁ হাতটা ওর মুঠোয়। অন্ধকারের মধ্যে কারা যেন ফিস ফিস করছে। দূরের রাস্তায়, বাস-ট্রামের বাতি ভুতুড়ে আলোর মতন ছোটাছুটি করছে। দেখতে দেখতে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে এল।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিলাম। ওর মুখের কাছে ঝুঁকে এসে বললাম, 'রাত অনেক হলো, এবার ওঠা যাক। আবার তো ফিরতে হবে।'

কৃষ্ণা আরো খানিকক্ষণ পর আমার হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কি ভেবে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। অস্ফুট গলায় বলল, 'তোমাকে যে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না রুদ্রদা।'

আমিও শেষবারের মতন দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরেছি। গালে, বুকে, ঘাড়ে পাগলের মতন চুমু খেয়েছি।

এরকম করেই দিনের পর দিন আমাদের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ হয়েছে। প্রতিবারই আমরা ভেবেছি, এর বেশী আর এগোন আমাদের ঠিক নয়। মনে মনে একটা গণ্ডীও টেনে দিতাম, ব্যাস, এর বাইরে কিছুতেই নয়। কিন্তু নিষেধের বেড়াটা সরতে সরতে যেন আমাদের কাছ থেকে অনেকটা সরে গেল। আমরা তখন এক ঘোরের মধ্যে। কখন একসময় আমরা নিষিদ্ধ এক খেলায় জড়িয়ে পড়লাম। এখন এই ক্রীড়াভূমি থেকে আমার কিংবা কৃষ্ণার, কারো পক্ষেই ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। কৃষ্ণা অসঙ্কোচে আজ তার সব ঐশ্বর্য আমাকে দিতে পারে, দিতে চায়। লোভীর মতন হাত বাড়িয়ে আমারও নিতে কোনোরকম সংশয় বা জড়তা নেই।

এর মধ্যে আমি কয়েকবারই ওদের বাড়ি গিয়েছি। ওর স্বামীর সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। ভদ্রলোকের তাপ উত্তাপ যেন একটু কম। বা আমারই বুঝতে হয়তো ভুল হয়েছে। দেখলে মনে হয়, বেশ বয়েস হয়েছে। কৃষ্ণার সঙ্গে বয়েসের পার্থক্যটা চোখে পড়ে। মাথা ভর্তি পাকা চুল। আস্তে আস্তে কথা বলে। ঘরের সম্পর্কে কেমন যেন শান্ত, উদাসীন। ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেই সারাক্ষণ ডুবে থাকতে ভালবাসে। কৃষ্ণা সম্পর্কে যেন ওর কোনোরকম কৌতূহল বা উচ্ছ্বাস নেই।

অথচ কৃষ্ণা অন্য কথা বলে। লোকটি নাকি পয়লা নম্বরের ভিজে বেড়াল। বাইরে থেকে বোঝবার কোনো উপায় নেই। ভেতরে বদ গুণ

বিস্তর। এখন যে নির্লিপ্ত বা নির্বিকার থাকার ভান করে, এটাও নাকি ওর দামী পোশাকের মতন বাইরের একটা আবরণ মাত্র। যে-কোনো সময়ে খুলে ফেলতে পারে। কৃষ্ণার চেয়ে ভাল আর কেউ ওকে চেনে না। ওর সম্পর্কে কৃষ্ণার রাগ ক্ষোভ জ্বালা ঘৃণা প্রচণ্ড। আমি প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলি। ও-ও আমাকে সব কথা আজো খুলে বলেনি।

ওর ফোন না পেলে সেদিনটা আমারও ভাল লাগে না। মনের ভেতরটা কেন যেন খচ্ খচ্ করতে থাকে। কাজে ঠিক মন বসে না। নিজেকে শক্ত রাখবার চেষ্টা করি। পারি না। প্রথমে ভেবেছিলাম, এটা তো একটা মজার খেলা। মন্দ কি! এখন দেখছি, এ-খেলা যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সারাক্ষণ ঘুণপোকার মতন আমার মনটাকে কাটছে তো কাটছেই। আমাকে যেন কোন্ অতলে টানছে। আমার সাজানো সংসার থেকে আমি ক্রমশ সরে যাচ্ছি। এটা কি কোনো বড় রকমের রোগের লক্ষণ! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!

অগত্যা আমাকেও ওর খোঁজ নিতে হয়। আমিই ওকে ফোন করি, 'কি হলো, আজ যে কোনো খবর নিলে না?'

কৃষ্ণা হাসে, 'দেখছিলাম তুমি কি কর।'

'হায় রাম! আমি আরো ভাবলাম, তোমার শরীর-টরীর খারাপ করল কিনা!'

'এত অল্পে আমার কিছু হয় না, বুঝলে?'

'বুঝলাম। কিন্তু ফোনটা একবার করে দিলেই তো হতো। কাল ওভাবে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার একটু ভয়ই হয়েছিল।'

কৃষ্ণা খিল খিল করে আবার হাসল। সামান্য পরে বলল, 'আসলে তোমাকে একটু পরীক্ষা করলাম।'

'পরীক্ষা?'

'হ্যাঁ গো মশায়, পরীক্ষা, পরীক্ষা— ; কি, অবাক হচ্ছ তো?'

'অবাক মানে, ভীষণ অবাক।'

'এখনও বুঝতে পারলে না ?'

'না !'

'মাথায় দেখছি কিচ্ছু নেই, স্রেফ গোবর।' কৃষ্ণার গলায় হাসির ঢেউ ওঠে।

'মানছি, এবার বলে ফেল।'

একটু সময় চুপ করে থাকে কৃষ্ণা। ছোট করে বার দুই কাশল, 'বুঝলে—'

'হ্যাঁ বল।'

'বলছিলাম কি, রোজ রোজ তো আমিই খবরাখবর নিই, তাই ভাবলাম, তাগিদটা কি একলা আমারই ?'

আমি এবার সশব্দে হেসে উঠেছি, 'ও, এই কথা ?'

'কেন, পছন্দ হলো না কথাটা ?'

'আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না, এত কাণ্ডের পর হঠাৎ এ-রকম একটা খেয়াল তোমার কি করে হলো ?'

'হওয়া উচিত ছিল না, কি বল ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক আছে, আর হবে না, খুশি ?'

'খুশি।' আমি আবার হাসি।

'এবার বল, তুমি এখন কি করছ ?'

আমি হাল্কা গলায় জবাব দিই, 'কিছুই না, ভাবছি।'

'কি ভাবছ ?'

'অনেক কিছু।'

'আহা, শুনিই না।'

আমি কৌতুক বোধ করছিলাম। হেসে হেসে বললাম, 'এই ধর, বউটা এখন কি করছে, কাল থেকে আমার ওপর ভীষণ চটে আছে। ছেলেটা স্কুলে গেছে কিনা। মেয়েটা কলেজ থেকে বাড়ি ফিরবে কি করে, কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়েছে, বোমা-টোমা পড়েছে, বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। অফিসে কাজের চাপ, কাল

ভাল ঘুম হয়নি, এ-রকম আরো বহু খুচ্‌খাচ্‌ ব্যাপার। কি, শুনবে?'

'এ যে দেখছি ঠাকুরদেবতার শতনামের পাঁচালী গাইতে শুরু করলে!'

'হলো না, বল রুদ্র-কৃষ্ণা পাঁচালী।'

কৃষ্ণা হাসতে থাকে।

আমি শুধোই, 'এবার তুমি কি করছ বল!'

'আমিও ভাবছি।'

'শুনতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। ধর, মেয়েটা অনেক্ষণ বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। উনি শরীর খারাপ নিয়ে কাজে বেরিয়েছেন, কি রকম আছে। আমার গা হাত পা ম্যাজ ম্যাজ করছে···কি, আরো শুনবে?'

'শুনছি, বলে যাও।'

'ভাগ, আর শুনতে হবে না।' মনে হলো, কৃষ্ণা যেন চোখ পাকিয়ে আমাকে কৃত্রিম ধমক দিল। মুখ টিপে টিপে বোধহয় হাসছে ও। পরমুহূর্তেই গলার সুর বদলে নিয়ে বলল, 'আর কোনো কথা নয়, ছুটির পর সোজা আমার এখানে চলে এসো। না না, এসো। ঠকবে না গো মশায়, বরং লাভই হবে।' ওর বলার মধ্যে যেন কি এক নেশা ছিল। ও আমার ভেতরের নিবুনিবু আগুনটাকে আবার যেন উসকে দিল।

আমি ঠিক বুঝতে পারি না, ওর সঙ্গে এই যে মাখামাখি, এতে আমার কতটুকু লাভ বা লোকসান। আসলে এ-সব হিসেব আমার মাথায় কখনো আসেনি। এলেও কিছু করার নেই। মাঝে মাঝে আমাদের এমন কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়, যেখান থেকে, ইচ্ছে থাকলেও সরে আসা যায় না। হয়তো, এতে আমাদের কষ্ট, যন্ত্রণা আরো বাড়েই, কিন্তু উপায় নেই। আমারও আজ এই অবস্থা। নতুন করে আবার আমি কৃষ্ণাকে পেয়েছি, কিন্তু যন্ত্রণা বেড়েছে। ওকে আমি এ-সব কথা বলিনি। আমার ঘরে আজ দারুণ অশান্তি,

ঝড়। আমার বউ আমাকে শুধু সন্দেহই করছে না, বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। ঘরের কাপ-প্লেট যখন তখন ভাঙছে। রাগে একদিন ফরফর করে দুটা দামী সিল্কের শাড়ী ছিঁড়ে ফেলেছে। কি যে করবে ও নিজেই যেন বুঝতে পারে না। আমাকে ও একদম সহ্য করতে পারছে না। আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে নানাভাবে ওর মন ভেজাবার চেষ্টা করেছি, পারিনি। আমার কোনো কথাই ও এখন শুনতে পারে না। মুখে গালিগালাজ। ছেলেমেয়ের সামনেও ও নানাভাবে আমাকে অপমান করতে ছাড়ে না। ওর ক্ষ্যাপামি আরো বেড়েছে। এর মধ্যে ও একদিন কামড়ে আমার রক্ত বের করে দিয়েছিল। মেয়েদের এ-রকম একটা কুৎসিত, হিংস্র চেহারাও যে আছে, আমার জানা ছিল না আগে।

অথচ কৃষ্ণার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়, বহুদিনের। ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল। ওর দাদা বিল্টু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। সবার চোখের আড়ালে কখন যে আমার আর কৃষ্ণার মধ্যে এক অন্তরঙ্গ, উত্তাপ-জড়ানো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, আজ আর তা ভাল করে মনে পড়ে না। ওরা টের পেয়ে তাড়াতাড়ি করে কৃষ্ণাকে এক ব্যবসায়ীর ঘরে বিয়ে দিয়ে দিল। উঃ, সে দিন-গুলো কি নিদারুণ দুঃখের আর যন্ত্রণার। হতাশায় বিষণ্ণতায় একাকার। চোরকাঁটার মতন বুকের যত্রতত্র গেঁথে গেল। সেগুলো একটা একটা করে তুলতে কতগুলো বছর যে আমার কেটে গেল! ওর কথা আমি ভুলে গেলাম একদিন। কখনো-সখনো আবছা, ধূসর কোনো স্মৃতির মতন টুকরো-টাকরা ঘটনা মনের ওপর ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে।

আবার যে কখনো ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে, আগের চেয়েও আরো এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠবে, ভাবিনি। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

সুব্রত আমার অফিসের বন্ধু। তার বোনের বিয়ে। আমরা অনেকেই নিমন্ত্রিত। আমার পৌঁছোতে বেশ দেরি হয়েছে। অথচ

ঠিক সময়েই বেরিয়েছিলাম। ট্রাফিক জ্যাম। জট খুলতে খুলতে প্রায় দু' ঘণ্টা। একেই বলে দুর্দৈব। গিয়ে দেখি, আমার পরিচিত সবারই ভোজন-পর্ব শেষ। অনেকে চলে গেছে। যে দু'একজন তখনো ছিল, তারাও একসময় চলে গেল। আমি এক কোণায় চেয়ারে চুপচাপ বসে আছি। এখন আর কোনো চেনা মুখ দেখছি না। একটু অস্বস্তিও হচ্ছিল। সুব্রত অন্যদিকে ব্যস্ত। আমি সিগারেট টানছিলাম। একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কখন একটি সতেরো-আঠারো বছরের মিষ্টি চেহারার মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, টের পাইনি। খেয়াল হলে দেখি মেয়েটি আমার চোখে চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। হাসি হাসি মুখে ও বলছে, 'মা আপনাকে একবার ডাকছে।'

আমি অবাক। একটু বিব্রত চোখে ওর দিকে তাকালাম। ভুল করছে না তো মেয়েটি! আমি তো ওকে ঠিক চিনতে পারছি না! আমাকে অন্য কারো চেনার কথাও নয়। মেয়েটি তখনো আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। সামান্য ইতস্তত করে আমি উঠে পড়লাম। ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি আমাকে ওর মা-র কাছে রেখে চলে গেল।

এবার আমার বিস্ময় আরো বেশী। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। এর জন্যে আমি তো তৈরী ছিলাম না! কেমন বিমূঢ়, বিহ্বল দৃষ্টি আমার।

'কি, চিনতে পারছ?' আমার চোখের ওপর ওর অপলক দৃষ্টি। ঠোঁটের ওপর ম্লান এক চিলতে হাসি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিতে পারলাম না। বুকের ভেতরটা যেন অনেক দিন পর আবার গুরগুর করে উঠতে চায়। গলার কাছে কি একটা যেন আটকে আছে। দু'একবার কেশে গলাটা সামান্য পরিষ্কার করে নিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আমার কেন যেন কষ্ট হচ্ছিল। আমি নিজেকে সংযত রেখে আস্তে আস্তে বললাম, 'তুমি, তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ—, কিন্তু তোমাকে যে দেখতে পাব ভাবিনি।' ওর চোখ-মুখ যেন ঝলমল করছে।

আবার শুধোলাম, 'এরা তোমার কেউ হয় নাকি?'

'প্রতিবেশী, তবে আত্মীয়ের মতই।' মুচকি হেসে ও ফের বলে, 'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।'

আমি চুপ করে থাকি একটু সময়। ওকে একথা আজ কি করে আমি বলি যে একদিন তোমাকে যেভাবে চিনেছি, সেখানে ভুল হওয়ার কিছু নেই। মৃত্যুর আগের দিনও যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং পুরো জ্ঞান থাকে, তাহলেও চিনতে ভুল হবে না আমার। কিন্তু এসব কথা আজ আর বলা যায় না। কেমন যেন সংকোচ বোধ করি। আরো খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললাম, 'এ ভুল যেন আমার জীবনে কোনোদিন না হয় কৃষ্ণা।' আমি হাসলাম। শুকনো হাসি। গলাটা আমার হঠাৎ কেমন নরম হয়ে আসে। জিভটা শুকনো, আঠা-আঠা লাগে।

কৃষ্ণা চোখ আনত করে। ওর মুখের ওপর সহসা যেন কালচে, মলিন এক ছায়া পড়ে। ও ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে। এই মুহূর্তে ওকে সামান্য বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। খানিক পরে আমার চোখে চোখ রেখে ও বলল, 'একটা সময় তোমাকে আমি ভীষণ-ভাবে খুঁজেছিলাম। তখন যদি তোমার একবার দেখা পেতাম—!'

আমি এবার একটু ঠাট্টা করলাম, 'তাহলে অসময়ে এলাম বল?'

কৃষ্ণা হাসল, 'তা হোক, কিন্তু আবার পেলাম তো তোমাকে।' ওর চোখে তখন অন্য রঙ। গলার স্বরে যেন অন্য শিহরণ। সর্বাঙ্গে এক আবেশ।

আমার বুকে আবার ধাক্কা লাগে। গায়ে কাঁটা দেয়। পায়ের তলা থেকে শির শির করে কি যেন একটা ওপরে উঠছে। আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মুখের ওপর কতকগুলো হিজিবিজি দাগ ফুটে উঠছে যেন।

কৃষ্ণা কি ভেবে আমার হাতটা টেনে নিল। মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আমাকে না বলে আবার চলে যেও না।'

আমি হাসলাম শুধু। সেদিন থেকেই কৃষ্ণার সঙ্গে আমার আবার নতুন করে পরিচয় হলো। তারপর একে একে অনেক কিছুই জানলাম।

এই প্রথম আমার চাকরি জীবনে একটানা পাঁচদিন অফিস কামাই হলো। আজ আবার অফিসে এলাম। অথচ কোনো অসুখ-টসুখ নয়, কোথাও বেড়াতে যাওয়াও নয়। আবার কৃষ্ণার ওখানেও এ ক'দিন যাইনি। যেতে পারিনি। যাওয়ার কোনো উপায় ছিল না আমার। একটা দমকা হাওয়া এসে যেন আমার সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। এরই মধ্যে আমি ক্লান্ত, ঝড়ের মধ্যে পড়ে যেন বিধ্বস্ত। এ ক'দিন আমি ঘুমুতে পারিনি। ভয়ে আতঙ্কে আমি আঁতকে উঠেছি। অস্থিরতা, ছটফটানি বেড়েছে। আজে-বাজে চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে। আরো কতরকম উপসর্গ। মনে হলো, দ্রুত আমার চেহারা ভেঙ্গে পড়ছে। কোনোরকম যত্ন নিতেও আমার আর আগ্রহ নেই! আমার বয়েস কি আরো বেড়ে গেছে? শেষপর্যন্ত যে এ রকম ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা আমাকে দেখতে হবে, ভাবিনি।

আজ অফিসে আসার পর থেকেই কৃষ্ণার কথা আমার ঘন ঘন মনে পড়েছে। নিশ্চয়ই ও আমার কোনো খোঁজ না পেয়ে আরো অস্থির হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে আমারও ওর কথা মনে পড়েছে। এতে আমার কষ্টই বেড়েছে শুধু। ওকে এই দুর্ঘটনার কোনো খবরও দিতে পারিনি।

কৃষ্ণা ফোন করেছে। গলায় উৎকণ্ঠা, অভিমান। আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম। ও আমাকে বার বার করে ওর বাড়িতে যেতে বলল।

ছুটির পরেও আমি একা একা আরো কিছুক্ষণ কাজ করলাম। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। চোখে জ্বালা, টনটনে ব্যথা।

ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে যেন। আমি জল খেলাম। কলতলায় গিয়ে চোখে-মুখে জল দিলাম। আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখলাম। এখনও মুখের রেখায় ক্লান্তি। একটু অবসন্ন, রুগ্ন ভাব চোখের কোণায় এখনো লেগে আছে।

আমি একসময় কৃষ্ণার বাড়িতে এলাম। তখন সাতটা বেজে গেছে। আকাশ মেঘে ভর্তি। কৃষ্ণা দরজা খুলে দিল। আমার দিকে চেয়ে ও চমকে উঠল, 'ওমা, এ কি চেহারা হয়েছে তোমার! কোনো অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি?'

আমি ম্লানভাবে হাসি, 'আরে না, কিছুই হয়নি আমার।'

'মুখে বললে কি হবে, দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে কি হয়েছে আর না হয়েছে।'

'দেখে কি সব বোঝা যায়!'

'খানিকটা তো যায়।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকাই, 'বল তো আমার কি হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু একটা হয়েছে। বল, মিছে কথা?'

'জানি না।'

'বুঝতে পেরেছি, আমার কাছে তুমি লুকোচ্ছ।'

'তোমার কাছে লুকোবার মতন আর কিছু নেই আমার।'

'হয়েছে।' কৃষ্ণা চোখ পাকিয়ে হাসে। একটু চুপ করে থেকে আবার ও বলে, 'ক'দিন তো অফিসও আসনি। একটা খবর পর্যন্ত দিলে না!'

'কোনো উপায় ছিল না কৃষ্ণা।'

'এদিকে তোমার কোনো খবর নেই, আর আমি ছটফট করে মরছি।'

'আমি তা জানতাম।'

'জেনেও কষ্ট দিতে বুঝি খুব ভাল লাগে?' গলার সুর ভেজা ভেজা। অভিমান গুমরে ওঠে। বলার মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না।

'এতে আমারও কিছু কম কষ্ট নয়।'

কৃষ্ণা দু'মুহূর্ত চুপ করে থাকে। আমাকে একবার ভাল করে ও দেখে নিল। পরে গভীর মমতামাখা গলায় বলল, 'কি হয়েছিল বল তো?'

'বলব।'

কৃষ্ণা আমাকে ওর শোবার ঘরে নিয়ে এল। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। জানালায় রঙিন বাহারে পর্দা। আরো কিছু কিছু শৌখিন জিনিসে ঘরটা সাজানো। এ-ঘরে আমি এর আগেও দু'তিনবার এসেছি।

'আগে কিছু খেয়ে নাও তুমি। বল কি খাবে?'

'এর আর জিজ্ঞেস করার কি আছে, যা দেবে তাই খাব। তার আগে একটু গড়িয়ে নিচ্ছি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার যেভাবে খুশি আরাম কর। তুমি তো আর এখানে নতুন নও।'

আমি ওর স্প্রিংয়ের নরম গদি-আঁটা খাটে শুয়ে পড়লাম। পরে কৃষ্ণার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কর্তা যদি এখন এসে পড়ে?'

কৃষ্ণা চোখে ঢেউ তুলে হেসে উঠল, 'কোনো সম্ভাবনা নেই, ব্যবসার কাজে দিল্লী গেছে, ফিরবে আরো দু' তিনদিন পরে। তাছাড়া এলই বা!'

'এ সাহস আগে ছিল কোথায়?'

'তুমি আর বলো না, ভীতুরাম। তোমার জন্যেই তো!' কৃষ্ণা আলতো করে আমার নাক টেনে দিল।

'তোমার মেয়েকেও তো দেখছি না!'

'ও আজই ওর পিসীর ওখানে গেল। বলে গেছে আজ আর ফিরবে না।'

কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে রহস্য। চোখে-মুখে দুষ্টুমি। ওর পরনে জর্জেট-প্রিণ্ট। ওর গা থেকে এক নেশা নেশা গন্ধ বেরোচ্ছে। আঁচলটা বুক থেকে পড়ে পড়ে যাচ্ছিল। ওটা ঠিক করে নিতে নিতে ও চলে গেল।

আমার জন্যে ডিমের পোচ, টোস্ট আর কফি করেছিল কৃষ্ণা। খাওয়া শেষ করে বালিশে হেলান দিয়ে আমি সিগারেট ধরালাম। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কৃষ্ণা উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করল। থেকে থেকে বাজ পড়ছে। ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি। ও আমার পাশে এসে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'আজ আর তোমার যাওয়া হবে না।'

আমি ওকে একটুক্ষণ নির্নিমেষে দেখলাম। এরকম ভাবে ওকে আগে আর কখনো পাইনি। ওর শরীরের মিষ্টি গন্ধটা যেন আমাকে কেমন আচ্ছন্ন করছে। শাড়ির আঁচলটা বুক থেকে মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে। সেদিকে ওর লক্ষ্য কম। আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাকে যে যেতেই হবে কৃষ্ণা।'

'এই ঝড়-জলে?' ও যেন একটু অবাক হলো। এরকম মুহূর্ত কি সব সময় আসে!

'হ্যাঁ, এর মধ্যেই যেতে হবে, কোনো উপায় নেই।' আমার দীর্ঘ-শ্বাস বেরিয়ে এল।

কৃষ্ণা আমার ডান হাতটা টেনে নিল। ওর কোলের ওপর রেখে আমার হাতের আঙ্গুলগুলো টানতে থাকে।

আমি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওর মুখের দিকে আবার তাকালাম। আস্তে আস্তে বললাম, 'বুঝলে কৃষ্ণা, এর মধ্যে আমার দারুণ এক অভিজ্ঞতা হলো।'

কৃষ্ণা আমার চোখে চোখে তাকাল। আমি আরো একটু সময় চুপ করে থাকলাম। শেষে বললাম, 'তুমি তো জান, আমার বউ অনেকদিন ধরেই আমাকে সন্দেহ করছে। এর মধ্যে আরো অনেক ছোটখাটো ঝগড়াঝাঁটি, মান-অভিমান অশান্তি হয়ে গেছে। সব তোমাকে বলিনি।'

কৃষ্ণা তখনো একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মুখের ওপর উৎকণ্ঠা, খানিকটা বিস্ময়, কৌতূহল।

আমি নীরবে সিগারেট টানি। একটু পরে আবার বললাম,

'আজ কিছুদিন ধরেই ও খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। ঘটনার দিন যেন ওর মাথাটা আরো খারাপ হয়ে গেল। আমাকে ছেলেমেয়ের সামনেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখে যা আসে তাই বলে গেল। ওর চেঁচা-মেচিতে অনেকেই ছুটে এল। ওরা যেন মজা পেয়ে গেছে। ওর এই অ্যাব্‌নর্‌মাল চেহারা আমি আগে আর দেখিনি। কি নোংরা আর কদর্য! পাঁচজনের সামনে আমার মাথা নীচু হয়ে গেল। আমি কোনো প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু এখানেই শেষ হলো না।' আমি আবার চুপ করে থাকি একটু সময়।

কৃষ্ণার চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া আরো ঘন হয়েছে। অস্ফুটে ও বলল, 'তুমি তো আমাকে আগে কখনো কিছু বলনি!'

'বললে হয়তো দুঃখ পেতে।' আমি সিগারেটটা শেষ করে টুকরোটা অ্যাস-ট্রেতে নিবিয়ে দিলাম। এবার এক কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। কৃষ্ণাও বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিল। একটু ঝুঁকে আমার মুখোমুখি সরে এল। ওর বুকের খানিকটা অংশ আমার শরীর ছুঁয়ে রয়েছে। ওর ঘন ঘন উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। আমি ওর একটা হাত টেনে নিলাম। আদর করে আস্তে আস্তে বললাম, 'ক'দিন ধরে বাড়িতে নেংটি ইঁদুরের খুব উৎপাত শুরু হয়েছিল। আমার অনেকদিনের জমানো দামী জিনিসপত্তর এন্তার কেটেকুটে নষ্ট করছিল। তাই ইঁদুর মারার বিষ এনে রেখেছিলাম ঘরে। আমার বউ সেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।'

কৃষ্ণা চমকে উঠেছে। টেনে টেনে বিড় বিড় করে বলল, 'বল কি, আত্মহত্যা?'

'হ্যাঁ।'

ওর চুলে আমার মুখ ঢাকা পড়েছে। আমি চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলি, 'এ নিয়ে ক'দিন খুব ঝামেলা গেছে। এখন একটু ভাল। কাল হাসপাতাল থেকে ও ফিরেছে। আমার দিকে এখন ও ভাল করে তাকাতে পারে না। খুব লজ্জা পায়। আশ্চর্য, এরই মধ্যে সব রাগ অভিমান যেন ও ভুলে গেছে।'

কৃষ্ণা কিছু বলল না। মুখও তুলল না। একসময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। শরীরটা থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠল। ওর চোখের জলে আমার বুক ভিজল। আমি ওর পিঠে হাত রেখে মৃদু ঠেলা দিলাম, 'এই, কাঁদছ কেন?'

কৃষ্ণা নিজেকে সামলাতে আরো খানিকটা সময় নিল। শেষে বলল, 'আমার জন্যেই তো তোমার আজ এরকম হলো!' ওর গলা যেন ধরে আসে। ঠোঁট কাঁপে থর থর করে। কথা জড়িয়ে যায়। ভীষণ কষ্ট যেন।

'এরকম কথা আর বলবে না তো তুমি!'

কৃষ্ণার চোখ ছল ছল। বুকের ভেতরটা কেন যেন আবার টন টন করে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। অনেকক্ষণ পর অনুচ্চ গলায় ও বলল, 'বিশ্বাস কর রুদ্রদা, আমার বাঁচবার আর কোনো সাধ ছিল না। ওই মানুষটার কাছ থেকেও একদিনের জন্যে ভালবাসা পেলাম না। ও যে কি নিষ্ঠুর আর শয়তান, কি বলব তোমাকে! আমার ওপর ও কি কম নির্যাতন করেছে! আজো ওর অত্যাচারের শেষ হলো না। আমার বাপ-মা শুধু টাকাটাই দেখেছিল।' টেনে টেনে আস্তে আস্তে কথা-গুলো বলে গেল কৃষ্ণা। মাঝে গলার স্বর কেটে গেছে। কখনো বা রাগে দুঃখে চোখ-মুখ ওর তেতে উঠেছে। ও আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। আর্দ্র, বিষণ্ণ দৃষ্টি। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ল। ওর দম যেন ফুরিয়ে গেছে। আরো একটু সময় নিয়ে কৃষ্ণা আবার বলতে শুরু করে, 'সেদিন তোমাকে ওই বিয়ে বাড়িতে দেখে আমার যে কি ভাল লাগল! আবার যেন নতুন করে বেঁচে উঠলাম। এবার ওর ওপর একটা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে আমার ভয়ানক লোভ হলো। তাছাড়া তোমার কথা যে আমি একদিনের জন্যেও ভুলতে পারিনি! এটা তোমাকে আমার বোঝানোর দরকার ছিল।' বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে কৃষ্ণা।

'আবার তুমি কাঁদছ?' আমি ওকে আরো গাঢ় করে কাছে টেনে নিলাম।

'কাঁদছি, কান্না ছাড়া আজ আমার আর কি আছে গো! আমার জন্যে এভাবে তোমাকে যে মূল্য দিতে হবে, তা তো ভাবিনি, ভাবিনি আমি!' কৃষ্ণা আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিল।

'দুঃখ কি কৃষ্ণা, একদিন তো আমি তোমারই ছিলাম, আজো না হয় তাই থাকব!'

কৃষ্ণা ভরাট চোখে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো ওর ফের জলে ভরে উঠেছে। ও কিছু বলল না।

আমিও চুপ করে থাকলাম। রাত বাড়ছে। এবার আমাকে যেতে হবে। কি বলে আর ওকে সান্ত্বনা দেব! আজ ওর কাছ থেকে আমি বিদায় নিতেই তো এসেছিলাম। পারলাম না। পারবও না। বুঝতে পারলাম, ওকে হারালে আমার কষ্টই বাড়বে। জানি না, হয়তো আমাকে এজন্যে আরো অনেক মূল্য দিতে হবে। আমি এখন মনের দিক থেকে তৈরী। তা বলে, বউ ছেলেমেয়েকেও ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো, এভাবেই জ্বলতে জ্বলতে একদিন আমি শেষ হয়ে যাব। তবু উপায় নেই। হয়তো, এরই নাম জীবন।

ওর উষ্ণ, ঘন সান্নিধ্যে আরো কিছুক্ষণ থেকে আমি উঠে পড়ি। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যেই একসময় ঘরের পথ ধরলাম।